কিশলয়

দ্বিতীয় ভাগ

(চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য)

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
রাইটার্স্ বিল্ডিংস্
কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৫৪

মূল্য ৷৷৶৬ আনা

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি

চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য কিশলয় দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রবীণ গণিতজ্ঞ রচনাবলী সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুস্তকখানিকে শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

যাঁহারা এই সংকলনে সহায়তা করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। রচনাবলীর লেখক ও স্বত্বাধিকারিগণের নিকটও শিক্ষা-অধিকার ঋণ স্বীকার করিতেছেন। গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ এই পুস্তকের সৌষ্ঠব সাধন করিয়া বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

রাইটার্স্ বিল্ডিংস্,
জানুয়ারী, ১৯৫১

শ্রীপরিমল রায়
শিক্ষা-অধিকর্তা

সূচীপত্র



বন্দে মাতরম্

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে ।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥
বন্দে মাতরম্ ॥

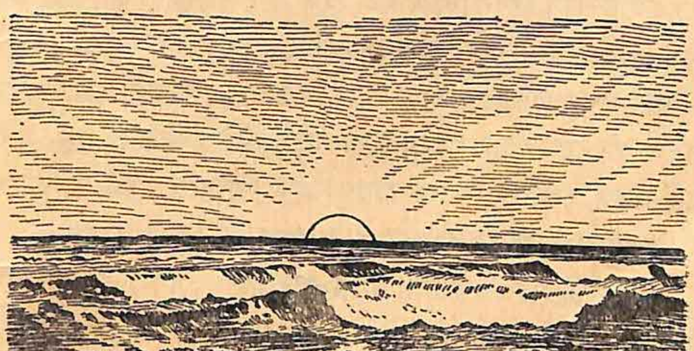


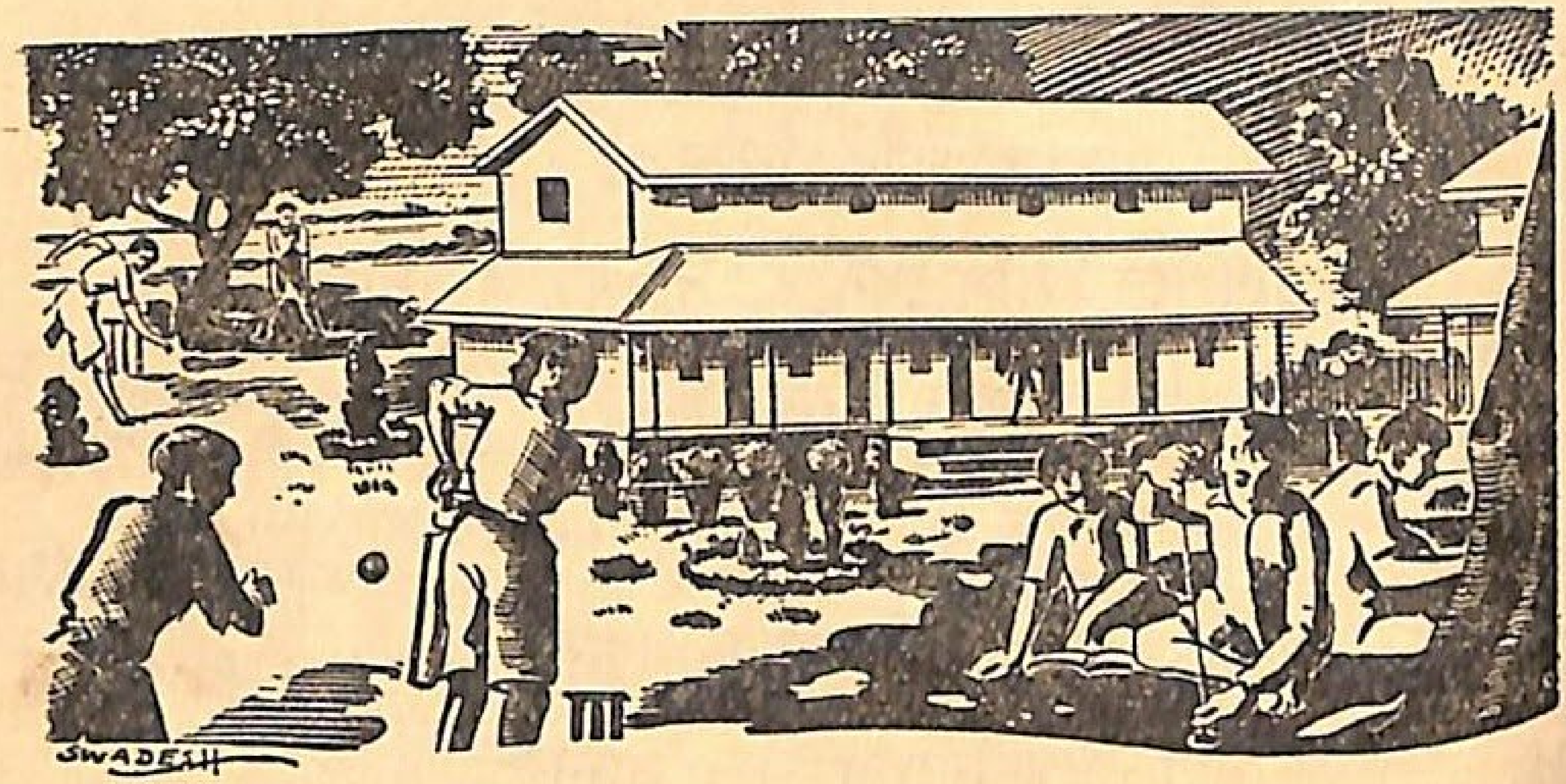
প্রার্থনা

প্রিয়ংবদা দেবী

জীবন আমার কর ফুলের মতন
শোভার আধার,
পবিত্র সুগন্ধে যেন সবাকার মন
তুষি অনিবার;
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে
শোভা করি আমার জীবন,
শরৎ হেমন্ত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষাতে
হে সুন্দর, থাক অনুক্ষণ!

অন্ধের যষ্টির মত কর গো আমারে
দুঃখীর নির্ভর,
প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী অনাথারে
সেবি নিরন্তর;
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে
প্রাণে বল করহ বিধান,
আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে
কাছে থাক, সর্বশক্তিমান্।





নতুন ইস্কুল

আমাদের গাঁয়ে নতুন ইস্কুল হয়েছে। উত্তর পাড়ায় রায়েদের একটা প্রকাণ্ড বাগান ছিল—সেখানে ইস্কুল বসে। নতুন নতুন কয়েকটা ঘর হয়েছে; সামনে ফুলের বাগান, পাশে সব্জির খেত, আর দক্ষিণ দিকে খোলা মাঠ আছে। পূব দিক দিয়ে ছোট নদী চন্দনী কুল কুল রবে বয়ে যাচ্ছে। ভারি সুন্দর লাগে আমাদের ইস্কুল-বাড়ি দেখতে।

আমাদের গাঁয়ের আশে-পাশের গাঁ থেকে বহু ছেলেমেয়ে এখানে পড়তে আসে। কেউ-বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তা ধ'রে আসে, কেউ-বা আসে সোজা মাঠ পেরিয়ে, কেউ-বা আসে খেতের আল ধ'রে। বর্ষাকালে অনেকে নৌকোয় আসে।

আমরা এসেই ইস্কুলের মাঠে জড় হই। সবাই লাইন করে দাঁড়াই। তারপর গান করি। কোনদিন গান করি—ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা, কোনদিন করি—তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে

কোনদিন-বা করি—করুনা-নয়নে চাহ প্রভু মোদের মুখপানে; অথবা, শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান। সবাই গান করি। তারপর খবর বলা হয়। প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একজনকে খবর বলতে দেওয়া হয়। কেউ-বা গাঁয়ের খবর বলে, কেউ-বা চাষের খবর বলে, কেউ-বা আবহাওয়ার খবর বলে, কেউ-বা মজার খবর বলে। সকলের বলা হ'লে আমাদের "বড় দাদা" কোন দিন কিছু বলেন। তারপর লাইন করে শ্রেণীতে চলে যাই। আমরা শিক্ষক মশায়দের দাদা বলি।

শ্রেণীতে গিয়ে প্রথমেই আমরা যার যার শ্রেণী ঝাঁট দিই ও আশে-পাশের জায়গা পরিষ্কার করে ফেলি। দাদা আমাদের সঙ্গে থাকেন। তারপর নাম ডাকা হয়। নেতা নির্বাচন হয়। নেতার কাজ বড় দায়িত্বপূর্ণ। তাঁর উপর শ্রেণীর যাবতীয় কাজের ভার থাকে। তারপর ডাক্তার নির্বাচন হয়। ডাক্তার আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখেন—আমরা দাঁত মেজেছি কি না, নখ কেটেছি কি না, মাথায় চিরুনি দিয়েছি কি না, জামা-কাপড় পরিষ্কার করেছি কি না এবং ভালভাবে পরেছি কি না। যদি কেউ না করে আসে, অমনি দাদা চিরুনি দিয়ে মাথার চুল ঠিক করে দেন—দাঁত মাজতে পাঠিয়ে দেন। আমাদের ডাক্তার আগে থেকেই নিমের দাঁতন ঠিক করে রাখেন।

ডাক্তারের কাজ হয়ে গেলে আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে আবার শ্রেণীর খবর বলি। সবাই যার যার খবর বলে। সেদিন অনুদের পোষা মেনিটা মরে গিয়েছিল। অনু সেই খবর বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিল। খবর বলা হলে আমরা হাতের কাজ করি। আমাদের শ্রেণীতে দাদা আগে থেকেই

অনেক জিনিস এনে রেখেছেন। আমরা কাদা নিয়ে খেলি, পুতুল গড়ি, আম বানাই, পাতা বানাই—আরও কত কি করি! কাঁঠাল পাতা দিয়ে মুকুট করি, খেজুর পাতা দিয়ে আসন বুনি—তাল পাতার বাঁশী বাজাই। কাঁচি দিয়ে ছবি কাটি; মালা তৈরী করি, রং আর তুলি দিয়ে কত ছবি আঁকি। বাঁশের কঞ্চির ডগায় পাট বেঁধে দাদা আমাদের জন্য সুন্দর ক'রে তুলি তৈরী করে দিয়েছেন। একদিন খেজুরের ডাল ছেঁচে তুলি করেছিলেন। আমাদের তকলি আছে—চরকা আছে। আমরা সুতা কাটি। মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ি; বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, মোড়া, মাতলা বুনি; কাঠের কাজ করি; সুতা কেটে কাপড় বুনি। আরো অনেক কাজ করি। আমরা যখন কাজ করি, দাদা তখন ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং আমাদের সঙ্গে নানা রকম গল্প করেন। হাতের কাজ হয়ে গেলে আমরা শ্রেণী গুছিয়ে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

তারপর আমরা পড়তে বসি। প্রথমেই আমরা যে যে কাজ করেছি তা নিয়ে দাদার সঙ্গে কত রকম আলাপ করি। তখন প্রসঙ্গক্রমে দাদা কত দেশ-বিদেশের কথা, কত জীবজন্তুর কথা, কত গাছপালার কথা নিয়ে আলোচনা করেন। পরে আমরা সব নিজেদের খাতায় লিখে ফেলি।

আমাদের আধ ঘণ্টা ছুটি থাকে। ছুটিতে আমরা খাবার খাই। আমাদের ইস্কুলে টিফিন দেওয়া হয়; কোন দিন মোয়া আর কলা, কোন দিন দুধ আর বিস্কুট। আমরা সেজন্য পয়সা দিই।

টিফিনের পরে আমরা পড়াশুনা করি। দাদা তখন যত্ন

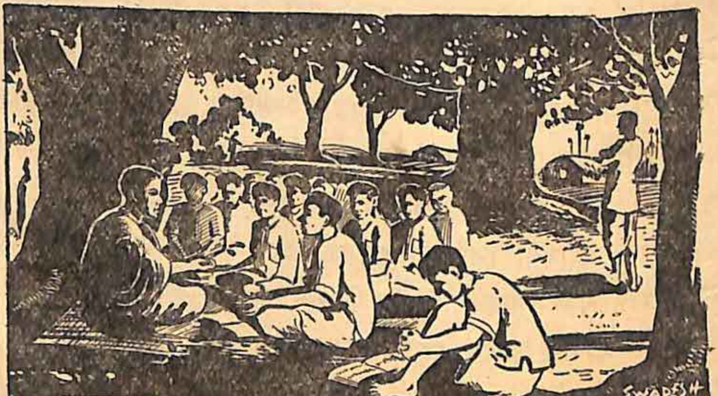
ক'রে আমাদের অঙ্ক কষান, বই পড়ান। রোদ প'ড়ে গেলে খেলা করি—ফুটবল, হাডু-ডু, দাঁড়িয়া বান্ধা, আরও কত মজার মজার খেলা। আমাদের ফুল-ফলের বাগান আছে। সব্‌জির বাগানও আছে। আমরা বিকালের দিকে বাগানে কাজ করি। কোদাল নিয়ে মাটি কোপাই, বালতি-ভর্তি জল এনে গাছের গোড়ায় দিই। বাগান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি কি করে বীজ হতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হতে চারা হয়। আমাদের বাগানে কত রংবেরং-এর ফুল ও ফল হয়।

দাদা কোন কোন দিন আমাদের সবাইকে নিয়ে নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে, হাটের মাঝে, পোড়ো মন্দির তলায় বেড়াতে যান, আর সেই প্রসঙ্গে ইতিহাস-বিজ্ঞান ও ভূগোলের কত নূতন নূতন খবর বলেন। আমাদের কয়েকটি পোষা পশু-পাখি আছে—আমরা রোজ তাদের খেতে দিই।

সপ্তাহে একদিন আমাদের সভা হয়। সেদিন সবাই মিলে ইস্কুলের বড় ঘরটায় একত্রে বসি। আমাদের মধ্যে থেকেই সভাপতি হয়। আমরাই কার্যসূচী তৈরী করি। আলপনা দিই, ফুল পাতা দিয়ে ঘর সাজাই। সভাপতির আসন করে দিই। কেউ-বা গান করি—কেউ-বা নাচি। সপ্তাহের মধ্যে হাতের কাজ যা করেছি তা দেখাই, কবিতা আবৃত্তি করি, গল্প বলি, নাটক করি। আমরা সারাটা সপ্তাহ সভার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকি। তা' ছাড়া আমরা বিভিন্ন ঋতুতে কত উৎসব করি। বর্ষায় বর্ষামঙ্গল, শরৎকালে শারদীয় উৎসব, বসন্তে বসন্তোৎসব ক'রে থাকি। মহাপুরুষদের জন্ম বা মৃত্যুতিথিতে তাঁদের স্মরণ করি।

আমাদের নিজেদের কাজ আমরা নিজেরাই করি। সেজন্য মন্ত্রিমণ্ডলী আছেন। কৃষির সময় কৃষি-মন্ত্রী, টিফিনের সময় খাদ্যমন্ত্রী, খেলার সময় ক্রীড়া-মন্ত্রী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সময় সাফাই-মন্ত্রী সকল কাজ পরিচালনা করেন। সভার ব্যবস্থা করেন কৃষ্টি-মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী সকল কাজের দেখাশুনা করেন।

দিনের শেষে সকল কাজ হয়ে গেলে আমরা গান ক'রে নেচে নেচে বাড়ি চলে যাই। কিন্তু ইস্কুলের জন্য মনটা কেমন করে। আমরা আমাদের ইস্কুলকে বড় ভালবাসি।





সংকল্প

অতুলপ্রসাদ সেন

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নত শির,—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান্,—নাহি ভয়॥
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে আজি মিলন মহান্,
দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়॥
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হ'তে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন,
ভারত-গগনে পুনঃ উদিবে সুদিন
ঐ দেখ প্রভাত উদয়॥



শকুন্তলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সা সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট নদ মালিনী।

মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছে ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দে যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরে ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজ ছিল। কত হাঁস, কত বক সারাদিন খালের ধারে, বিলের জ ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাখি, কত টিয়াপাখির ঝ গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধ দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণ-শিশু কুশের বনে, ধা

ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত; বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে (তিন হাজার বছরের) এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন; তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতকগুলি ঋষিকুমার।

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কি করত?—

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাইবাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল—ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণু-বাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল—খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল—মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধকথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফলফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকীর বনে আমলকী, হরীতকীর বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে

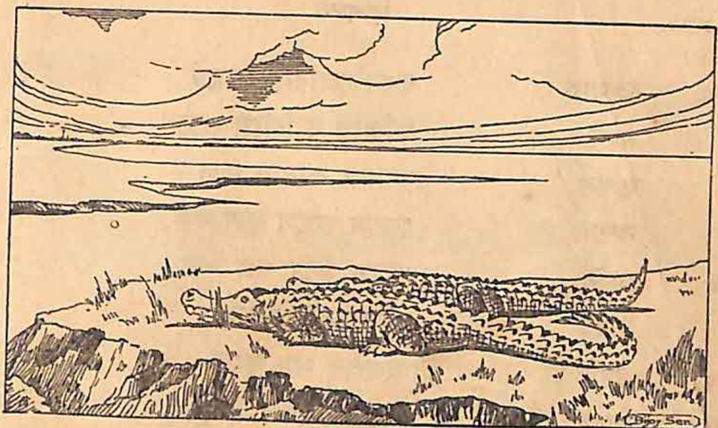
পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে মা-গৌতমীর কোলেপিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ ছিল না; কিন্তু যারা পর ছিল— তারা তার আপনার হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঋষিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর—সে-ও তার আপনার, এমন-কি বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল— তার বড়ই আপনার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া, প্রিয়ংবদা; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণ-শিশু—বড়ই ছোট—বড়ই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ—ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ, সকালে-সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকা লতায় বিয়ে দেবার কাজ। শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবী লতায় জল দিত।

এ-ছাড়া আর কি কাজ ছিল? হরিণ-শিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতাবিতানে গুন-গুন গল্প করা, নয় তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসান; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

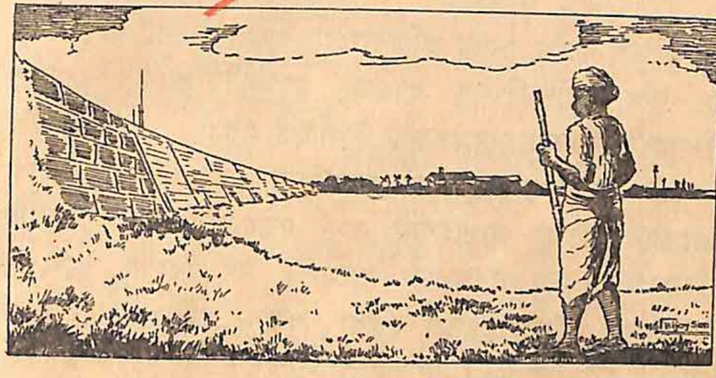


নদী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।
হোথায় গহন গভীর বন—
তীরে নাহি লোক, নাহি জন।
শুধু কুমির নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ,
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ;
রাতে চুপি চুপি আসে ঘাটে,
জল চকো চকো করি চাটে॥

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে
নদী ফুলিয়ে দুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল—
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে উঠে খল খল,
তরী করি উঠে টলমল।
নদী অজগর সম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা পড়ে—
তখন চলে যায় সরে সরে,
তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে,
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেন বুকের হাড়ের মতো॥
নদী চলে যায় যতদূরে
ততই জল উঠে পুরে পুরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক্ হয়ে যায় ভুল।
নীল হয়ে আসে জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা।
ক্রমে নীচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল;
ডাঙা কোন্‌খানে পড়ে রয়
শুধু জলে জলে জলময়॥



দামোদরের বাঁধ

নদী আমাদের বহু উপকার করে। আমরা নদীর জলে স্নান করি, নদীর জল খাই, খাল কাটিয়া চাষ আবাদের জন্য নদীর জল নানাভাবে ব্যবহার করি। ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক দিয়া নদীগুলি আমাদিগকে অনেক সাহায্য করে; আমাদের দেশে যে-সব জিনিস বেশী উৎপন্ন হয়, সেগুলি নদীপথে বিদেশে চালান দেওয়া হয়; আবার অন্য দেশ হইতে নানা জিনিস আমাদের দেশে আনা হয়। তাহা ছাড়া নদীপথে আমরা নানা স্থানে যাতায়াতও করি।

যে নদী আমাদের এত উপকার করে—সেই নদীতে বন্যা দেখা দিলে মানুষের দুঃখদুর্দশার আর অন্ত থাকে না। কত লোকের ঘরবাড়ি জলে ভাসিয়া যায়—কত গৃহপালিত জীব-জন্তুর প্রাণনাশ হয়—কত শস্যের ক্ষতি হয়—আর রোগে অনাহারে কত লোক মারা যায়। দামোদর, বরাকর ও

রূপনারায়ণ নদের বন্যায় প্রতিবৎসরই বাংলা দেশের বহু ক্ষতি হয় এবং মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলার অধিবাসীদের দারুণ দুঃখকষ্ট উপস্থিত হয়।

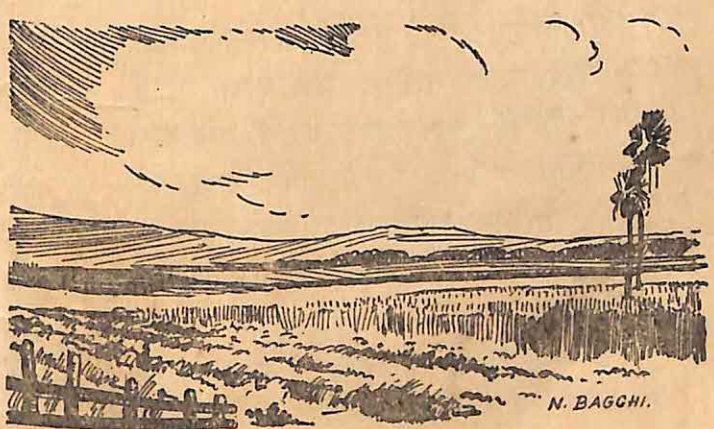
এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এবং নদীকে আরও ভালভাবে কাজে লাগাইবার জন্য দামোদরে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। দামোদর নদ বিহার প্রদেশের পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। বর্ষাকালে ইহাতে এত বেশী জল হয় যে তাহাতে দুই কূল প্লাবিত হইয়া বন্যা হয়—আবার বর্ষাশেষে নদীতে আদৌ জল থাকে না। পলিমাটি ও বালুকণা ধীরে ধীরে জমাট হইয়া নদীবক্ষ ভরাট হইয়া উঠিয়াছে।

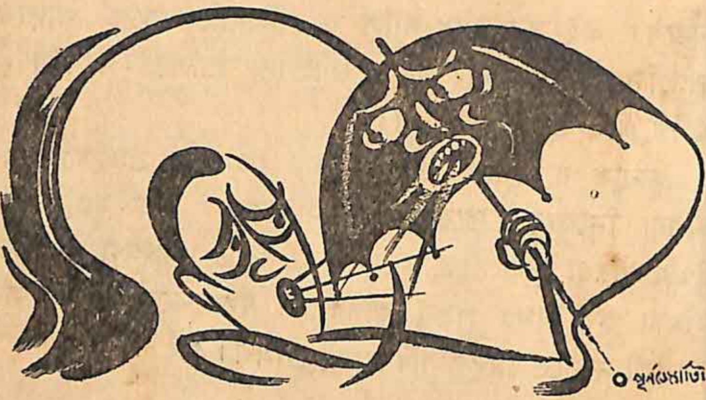
দামোদর নদে সাতটি বাঁধ দেওয়া হইবে। বর্ষাকালের প্রচুর জল এই সব বাঁধে ধরিয়া রাখা হইবে। তাহাতে জলের বেগে দেশ ভাসিয়া যাইতে পারিবে না। যখন নদীতে জল থাকিবে না, তখন এই সব জল চাষের কাজে লাগান যাইতে পারিবে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার অনেক জমিতে চাষের সুবিধা হইবে।

জলের স্রোত হইতে যে "বিদ্যুৎ" উৎপন্ন হয় তাহাকে জলবিদ্যুৎ বলা হয়। এই সাতটি বাঁধে যখন জলের স্রোত আসিয়া পড়িবে তখন প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। এই জলবিদ্যুৎ হইতে ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় ইলেকট্রিক আলো জ্বলিবে। সুলভ তড়িৎ-শক্তির ফলে ঐ সব জায়গায় ছোট ছোট কুটির-শিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়িয়া

উঠিবে। এই সব বাঁধে বালি ও পলিমাটি আটকা পড়িবে; সেগুলি আর হুগলী নদীর মোহনায় আসিতে পারিবে না, নদীগুলিও ভরাট হইবে না।

মানুষ বুদ্ধিবলে ও বিজ্ঞানের কৌশলে প্রকৃতিকে বশ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনে লাগাইতেছে। কত মরুভূমিকে উর্বর করিয়া তুলিতেছে, কত পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কত নগর পত্তন করিয়াছে। সিন্ধুনদের শক্কর বাঁধ, কাবেরী নদীতে মেতুর বাঁধ খুবই প্রসিদ্ধ।

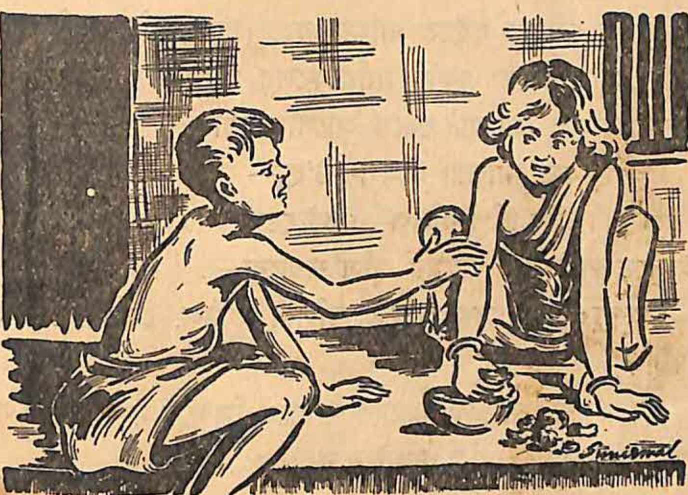




যথাকর্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছাতা বলে, "ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়,
এ অন্যায় অবিচার আমারে না সয়।
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,
রৌদ্র বৃষ্টি যতকিছু সব আমা-'পরে।
তুমি যদি ছাতা হতে কী করিতে দাদা?"
মাথা কয়, "বুঝিতাম মাথার মর্যাদা।
বুঝিতাম, তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা।"



আমের কুসি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। অপু আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে। এমন সময় তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠাল তলা হইতে ডাকিল—অপু—ও অপু......

সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু ভয়-মিশ্রিত। দুর্গার বয়স দশ এগার বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রঙ অপুর মতো এতটা ফরসা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে। মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর।

অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কি রে?

দুর্গার হাতে একটি নারিকেলের মালা। সেটা সে নিচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসি জরাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল, কোথা পেলিরে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটুলিদের বাগানে সিঁদুর কোটোর তলায় পড়েছিল—আন দিকি একটু নুন আর তেল।

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে! আমার কাপড় যে বাসী!

—তুই যা না শিগ্‌গির করে, আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েছে—শিগ্‌গির যা—

অপু বলিল—নারকেলের মালাটা আমায় দে, ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো; তুই খিড়কি দোরে গিয়ে দ্যাখ মা আসচে কি না।

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল—তেল টেল যেন মেজেতে ঢালিস নে; সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে; তুই তো একটা হাবা ছেলে!

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, বলিল—নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?

—অতগুলো বুঝি হলো? এই তো—ভারি বেশি—যা আচ্ছা নে আর দু'খানা—বাঃ দেখতে বেশ হয়েছে রে—একটা লঙ্কা—একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তা হলে—

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি! মা যে তক্তার ওপরে রেখে দ্যায়—আমি যে নাগাল পাইনে!

—তবে থাকগে যাক—আবার ওবেলা আনবো এখন। পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেছে, দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে!

খিড়কির দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শোনা গেল—দুগ্‌গা, ও দুগ্‌গা......

দুর্গা বলিল—মা ডাকচে, যা দেখে আয়—ওখানে রেখে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে—মুছে ফ্যাল—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দেবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জরানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গো-গ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনসূচক হাসি হাসিল।

দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া

দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফেল না বাঁদর—নুন লেগে রয়েছে যে!

পরে দুর্গা নিরীহ ভাল মানুষের মতো বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? এতবড় মেয়ে, সংসারের কুটো গাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো-টো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায় গেল?

অপু আসিয়া বলিল—মা খিদে পেয়েছে।

—রোসো, রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু, একটুখানি হাঁপ ছাড়তে দাও! তোমাদের রাতদিন খিদে, আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ! ও দুগ্গা, দ্যাখ ত বাছুরটা ডাক পাড়ছে কেন?

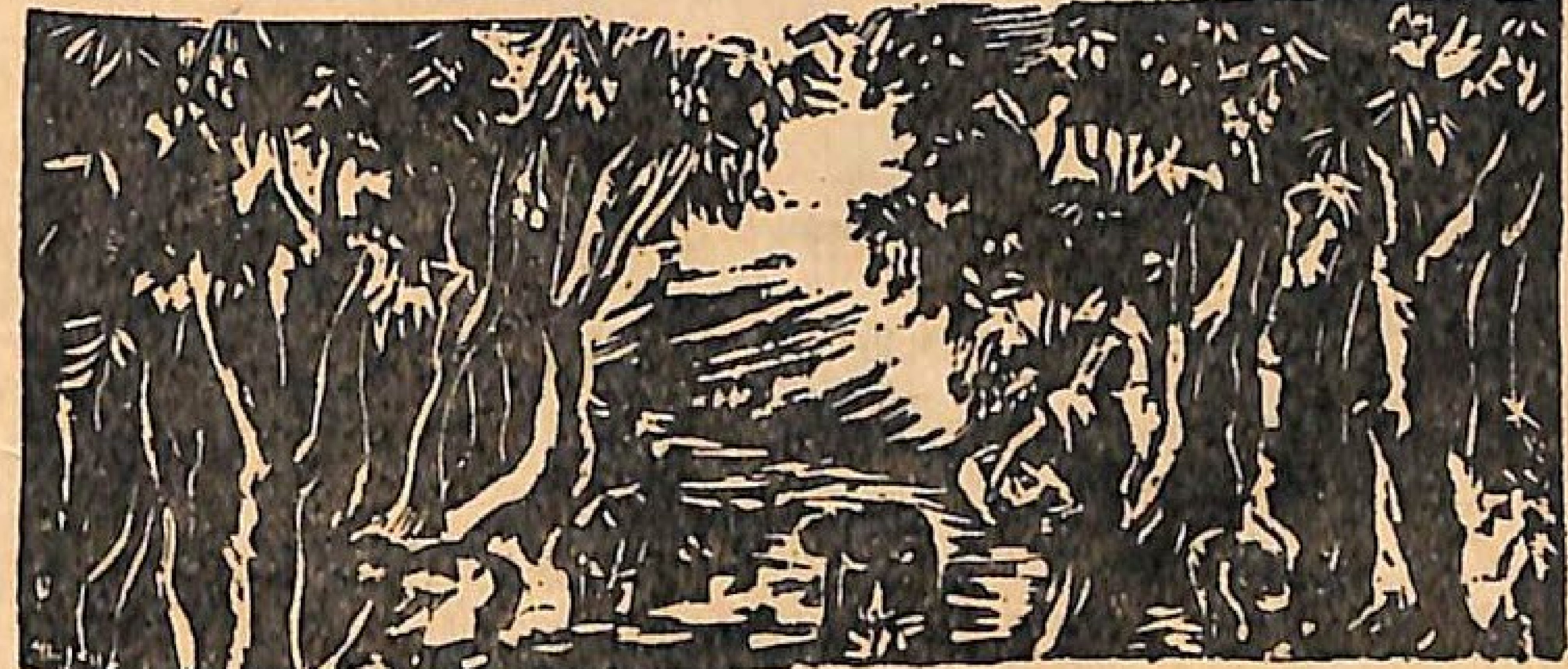
খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে!

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সংকুচিত সুরে বলিল—চাল-ভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ চিবানো যায় না, আম খেয়ে যা দাঁত টকে...দুর্গার ভ্রূকুটি-মিশ্রিত চোখ টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি? সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

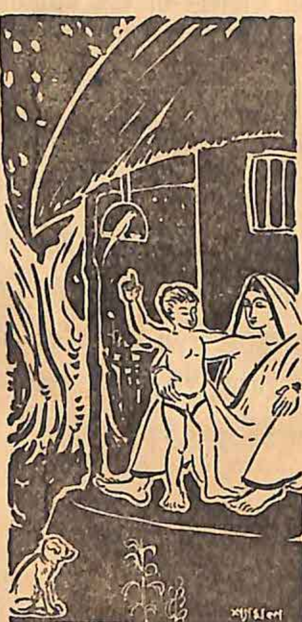
দুর্গা বিপন্ন মুখে বলিল—ওকে জিজ্ঞাসা করো না? আমি এই তো কাঁঠাল তলায় দাঁড়িয়ে—যখন ডাকলে তখন তো...স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুইতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা, ডেকে ডেকে সারা হোল!

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ-দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তার পিঠে দুম করিয়া এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েচে! আর কোন দিন আম দেবো—ছাই দেবো। এই ওবেলাই পটুলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জরাবো, এত বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়? খেও এখন! হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!......



সমব্যথী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



(১)

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?

সত্যি করে বল্,
আমায় করিস নে মা ছল—
বলতে আমায়, 'দূর দূর দূর!
কোথা থেকে এল এই কুকুর'?
যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে।

(২)

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে
তবে পাছে যাই মা উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে?
সত্যি করে বল্,
আমায় করিস নে মা ছল—
বলতে আমায়, 'হতভাগা পাখি
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি'?
তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে মা।
আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে।



বিত্যাসাগরের জননী

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জননীর নাম ভগবতী দেবী। তাঁহার মত দয়াবতী মহিলা কমই দেখা যায়। শৈশবে তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। স্নেহ ও যত্নের ভিতর দিয়া তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার প্রাণ গরীব দুঃখীদের জন্য কাঁদিত এবং সাধ্যমত তিনি তাহাদের দুঃখের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভগবতী দেবীর বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর। শোনা যায়— সেই সময় এক গরীব স্ত্রীলোক আসিয়া নিজের দুঃখের কাহিনী বলে এবং বস্ত্রাভাবের কথা জানায়। ভগবতী দেবীরও বেশী কাপড় ছিল না। তবুও তিনি নিজের দুইখানা ভাল কাপড় সেই স্ত্রীলোকটিকে দিয়া দিলেন; আর নিজে একটা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া রহিলেন। তাঁহার এই

প্রকার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া সবাই মুগ্ধ হইয়া গেল।

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মাত্র এগার বৎসর বয়সে ভগবতী দেবীর বিবাহ হয়। শ্বশুরালয়ে তাঁহাকে সবাই ভালবাসিত। তিনি কোন সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন না। কোন না কোন একটা কাজে সব সময়ই ব্যস্ত থাকিতেন। সকালবেলা সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি নিজের হাতে করিতেন। দুপুরবেলা আহারাদির পর যে সময়টুকু পাওয়া যাইত তাহাও তিনি নষ্ট করিতেন না। সেই সময় গুরুজনদের মুখে নানাবিধ গল্প শুনিতেন এবং চরকায় সুতা কাটিতেন।

তখনকার দিনে কাঁথা সেলাই করা মেয়েদের একটা বড় গুণ ছিল। বাড়িতে কত পুরানো জামা কাপড় থাকে; সেই সব ব্যবহারের অনুপযোগী ছেঁড়া কাপড়-চোপড় দিয়া তিনি খুব সুন্দর সুন্দর কাঁথা তৈরী করিতে পারিতেন এবং চরকায় খুব সূক্ষ্ম সুতা কাটিতে পারিতেন। এ জন্য সবাই তাঁহাকে খুব ভালবাসিত।

নিজের সুখ-সুবিধার প্রতি ভগবতী দেবীর তেমন কোন লক্ষ্য ছিল না। অপরকে সুখী করিতে পারিলেই তিনি সুখী হইতেন। তাঁহার পুত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাকে সুখে রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ভগবতী দেবী অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় মাকে একটি খুব ভাল লেপ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবতী দেবী লেপ গায়ে না দিয়া ছেঁড়া কাঁথা গায়ে

দিয়া শুইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মায়ের এই ব্যবহার দেখিয়া খুব দুঃখিত হন। তিনি মায়ের জন্য কত যত্ন করিয়া একটি লেপ আনিলেন, আর তাঁহার মা কি না কাঁথা গায়ে দিয়া শীত কাটাইবেন! ভগবতী দেবী পুত্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"বাবা! আমাদের এই গ্রামে কত লোক শীতে কষ্ট পাইতেছে। তাহাদের গায়ে দিবার মত কিছুই নাই। আমি তাহাদিগকে ফেলিয়া লেপ গায়ে দিই কি করিয়া? তুমি বরং প্রত্যেকের জন্য একখানা করিয়া কম্বল আনিয়া দাও।" মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মায়ের এই বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

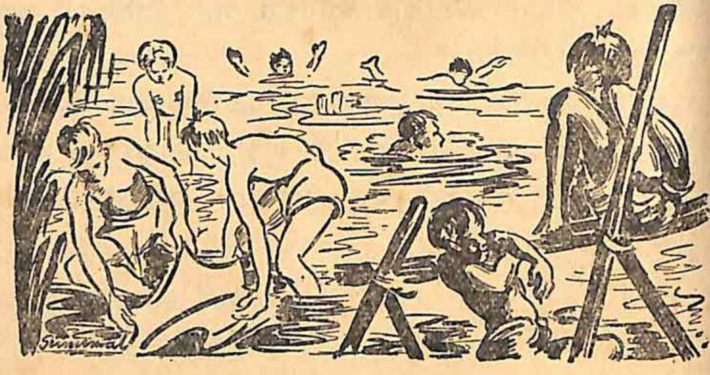
আর একবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার মাকে বলেন—"মা, আমার বড় সাধ হইয়াছে—তোমাকে তিনখানা সোনার অলংকার পরাই!" মা পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি ত জান, অলংকার পরিবার আমার কোন সাধই নাই। এই সব সোনার অলংকার পরিয়া আমার মন ভরিবে না। বিদ্বান্, চরিত্রবান্ ও গুণবান্ সন্তানই মাতার শ্রেষ্ঠ অলংকার। মূর্খ, গুণহীন ও চরিত্রহীনের মাতাকে কেহ সম্মান করে না। পুত্র যদি গুণী হয় তবে পুত্রের সম্মানের সহিত মায়েরও সম্মান বাড়িয়া যায়। তুমি যে সম্মান পাইয়াছ, তাহাতেই আমি সুখী হইয়াছি। তবে তুমি যদি সত্য সত্যই আমাকে তিনখানি অলংকার দিতে চাও, তবে আমাদের এই গ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়, ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে থাকিবার জন্য একটি ছাত্রাবাস ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দিয়ো।

তাহাতেই আমার অলংকার পরিবার সাধ মিটিবে। আমি তাহাতেই সুখী হইব।"

মায়ের কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব আনন্দিত হইলেন এবং মায়ের ইচ্ছানুযায়ী স্কুল, ছাত্রাবাস ও দাতব্য চিকিৎসালয় অচিরেই তাঁহাদের গ্রামে স্থাপন করিলেন।

[চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বিদ্যাসাগর-চরিত' অবলম্বনে]





জলক্রীড়া

কাশীরাম দাস

আসিয়া প্রভাস-তীরে যাদব-মণ্ডলী।
জলে নামি স্নানদান করে কুতূহলী॥
পরম আনন্দে জলে করেন বিহার।
সলিলেতে কেলি করে সকল কুমার॥
কূল হ'তে ঝাঁপ দিয়া কেহ পড়ে জলে।
অন্য অন্য কেহ জল সিঞ্চে কুতূহলে॥
জলেতে সাঁতারি কেহ যায় দূরাদূর।
বহুক্ষণ জলে ডুবি রহে কোন শূর॥
নানা মতে ক্রীড়া করে যাদব সকল।
কল্লোলে হিল্লোল করে প্রভাসের জল॥

টান মারি গেঁড়ু কেহ ফেলে বহুদূরে।
সাঁতারিয়া গিয়া কেহ আনয়ে সত্বরে॥
পুনঃ সেই গেঁড়ু লয়ে খেলে শিশু সব।
পরস্পর হাতাহাতি সকল যাদব॥
দেখিয়া অপূর্ব ক্রীড়া সবে পায় প্রীতি।
রামকৃষ্ণ সাত্যকি দেখিয়া হৃষ্টমতি॥
হেন মতে বহুক্ষণ বিহারিয়া জলে।
স্নানকর্ম সমাপিয়া যাদব সকলে॥
হরষিয়ে কূলে উঠি পরিল বসন।
চিনিয়া পরিল নিজ বস্ত্র আভরণ॥
একত্র বসিল সব যাদব-মণ্ডলী।
নানা উপহার দ্রব্য ভুঞ্জে কুতূহলী॥
অন্যের অন্যের মুখে দেয় জনেজন।
পরম হরিষে সবে করেন ভোজন॥



আকবর শাহ

আকবর শাহ দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার মত ন্যায়-পরায়ণ সম্রাট্ জগতে বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান সকলেরই সমান অধিকার ছিল।

আকবর শাহের পূর্ব্ববর্তী পাঠান রাজারা তাঁহাদের হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের সমান চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসাইয়াছিলেন। তীর্থস্থানে তীর্থ করিতে গেলে প্রত্যেক হিন্দুকেই কর দিতে হইত—নহিলে তীর্থস্থানে যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু মুসলমানেরা যদি কোন তীর্থস্থানে যাইত—তবে তাহাদের কর দিতে হইত না। সম্রাট্ আকবর দেখিলেন—ইহা অত্যন্ত অবিচার, ধর্মবিষয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই স্বাধীনতা থাকা উচিত। তিনি এই কর উঠাইয়া দেন।



আকবর
(আর্ট সেকসন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের সৌজন্যে)

আকবর শাহ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার মা পালকি চড়িয়া লাহোর হইতে আগ্রায় যাইতেছিলেন। কথিত আছে, আকবর শাহ নিজের কাঁধে পালকি লইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মায়ের আদেশ সব সময়েই পালন করিয়া চলিতেন; কিন্তু একবার পালন করেন নাই।

আকবর শাহের মাতা খবর পাইয়াছিলেন যে কয়েকজন পর্তুগীজ নাবিক একটি জাহাজ লুট করিয়া একখণ্ড কোরান গ্রন্থ পাইয়াছিল। পরে তাহারা সেই গ্রন্থটিকে একটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বাজনা বাজাইয়া শহরময় ঘুরাইয়াছিল। কোরান ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। তাহার এইরূপ অবমাননার কথা শুনিয়া তিনি খুব দুঃখিত হন এবং সম্রাট্‌কে অনুরোধ করেন যে, একখণ্ড বাইবেল গাধার গলায় বাঁধিয়া আগ্রা শহর ঘুরানো হউক। বাইবেল খ্রীষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

সম্রাট্ আকবর শাহ জননীর এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—"মা, সকল ধর্মের মূলকথা একই। কোন ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের প্রতিই ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। একখানি নিরীহ ধর্মগ্রন্থের উপর প্রতিশোধ নেওয়া কোন কাজের কথা নয়। হিংসার দ্বারা হিংসা দূর করা যায় না; প্রেমের দ্বারা উহা জয় করিতে হয়। উপরন্তু একদল নাবিকের পক্ষে যে-কাজ এত নিন্দনীয় হইয়াছে —একজন সম্রাটের পক্ষে তাহা শোভা পায় না।"

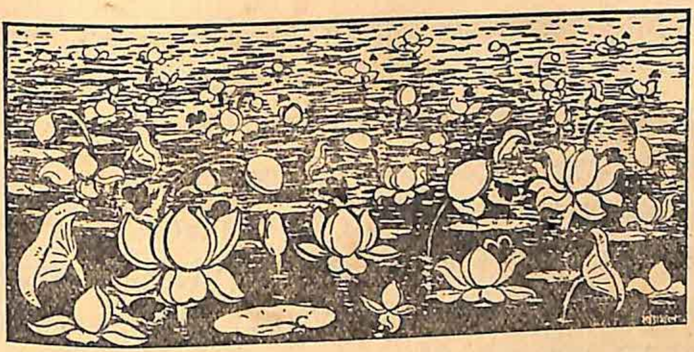
বিদেশী বণিকদের নিন্দনীয় আচরণের জন্য তিনি অবশ্য অন্যভাবে তাহাদের শাস্তি দিয়াছিলেন।



বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরে ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।



গাছের ঘুম

জগদানন্দ রায়

গাছেরা নিতান্ত নিরীহ জীব,—ডাল ভাঙ্গিলে, ফুল-পাতা ছিঁড়িলে তাহারা একটি কথাও বলে না। কুড়ুল দিয়া গোড়া কাটিতে আরম্ভ করিলেও, যতক্ষণ পারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। চুপ করিয়া থাকাই তাহাদের স্বভাব। গাছ কথা কহিতে পারে না; এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে পারে না; তাহাদের মুখ চোখ কান কিছুই নাই। সুতরাং তাহারা কি রকমে ঘুমাইবে—এ প্রশ্ন সকলেরই মনে জাগে। কিন্তু গাছেরা সত্যই ঘুমায়, তাহাদের পাতা ও ফুলও ঘুমায়।

আমরা দিনের বেলায় চলিয়া ফিরিয়া হাত-পা নাড়িয়া যে কাজ-কর্ম করি, তাহাতে আমাদের শরীরের ক্ষয় হয়। এমন কি জাগিয়া থাকিয়া যদি গল্পের বই পড়ি বা কোনরকম চিন্তা করি, তাহাতেও আমাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই ক্ষয়

ও ক্লান্তি নষ্ট করিবার জন্যই ঘুমের ব্যবস্থা আছে। আমরা যখন ঘুমাই তখনি আমাদের দেহে নূতন রক্ত এবং নূতন মাংস উৎপন্ন হয়। গাছেরা মাটি হইতে রস শুষিয়া খায় এবং পাতা মেলিয়া সূর্যের তাপ ও আলো টানিয়া লয় এবং ফুলগুলিকে ফুটাইয়া প্রজাপতি ও মৌমাছিদের ডাকে এবং তাহাদিগকে মধু খাওয়ায়। এই রকমে প্রতিদিনই দিবারাত্রি তাহাদিগকে অনেক কাজ করিতে হয়। ইহাতে গাছপালার শরীরের ক্ষয় এবং ক্লান্তি হয় না কি? কাজেই একটু না ঘুমাইলে গাছেরাও বাঁচে না। খাটিয়া-খুটিয়া ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলে আমাদের চোখ দু'টা আপনিই আঁটিয়া আসে,—আমরা তখন ঘুমাইয়া পড়ি। গাছেদের অবস্থা তাহাই হয়; ক্লান্ত হইলে কোনরকম চেষ্টা না করিয়াই তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রাণীদের মধ্যে অনেকে অনেক-রকমে ঘুমায়। মানুষ সাধারণত দিনে কাজ-কর্ম করিয়া রাত্রিতে ঘুমায়। আবার যারা রাত্রিতে রেলে কাজ করে বা পাহারা দেয়, তাহাদের কেহ কেহ দিনেই ঘুমায়। দিনের বেলায় পোকা-মাকড় ধরিয়া না খাইলে পাখীদের ক্ষুধা যায় না। তাই ইহারা দিনে চলাফেরা করিয়া আমাদেরি মত রাত্রিতে ঘুমায়। যে-সব প্রাণী রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া চোরের মত পরের অনিষ্ট করে, তাহারা দিনে ঘুমাইয়া রাত্রি জাগে। ছাগল, ভেড়া, কুকুর-ছানা ধরিয়া খাইবার জন্য বাঘ ও শেয়ালের দল দিনে ঘুমাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটায়। আবার এ-রকম প্রাণীও অনেক আছে, যাহারা দুই তিন মাস দিবারাত্রি ঘুমাইয়া কাটায়। তা-ছাড়া মৌমাছি,

বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি অনেক পোকা-মাকড়ও খুব শীতের সময়টা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়।

যে-সব গাছ, সাপ ও ব্যাঙের মত তিন মাস ধরিয়া ঘুমায়—আদা, হলুদ, ওল, কচু, রজনীগন্ধা সেই জাতীয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল এবং শরৎকালে রৌদ্র পাইয়া এই গাছগুলি খুব বাড়িয়া উঠে। গাদা গাদা কেঁচো ও পোকা খাইয়া ব্যাঙ যেমন মোটা হয়, এই সব গাছের পাতা ও মূল সেই রকমে বড় হইয়া দাঁড়ায়। তারপরে শীতকাল আসিলেই এই গাছগুলি ব্যাঙের মত ঘুমাইতে আরম্ভ করে। তখন তাহাদের পাতা ও ডাল শুকাইয়া যায়। আমরা মনে করি গাছগুলি বুঝি মরিয়া গেল। কিন্তু তাহারা মরে না। ব্যাঙ যেমন মাটির তলায় বা পুকুরের জলে মরার মত পড়িয়া থাকে, ইহারাও পাতা ও ডালের সার বস্তু শিকড়ে চালান দিয়া, শীতকালে চুপ করিয়া ঘুমায়। তখন ইহাদের গোড়ায় কলসী কলসী জল ঢালিলেও সেই ঘুম ভাঙে না। তারপরে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির জল গোড়ায় পেঁাছিলেই তাহারা জাগিয়া উঠে। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া প্রাতঃকালে যখন আমরা জাগিয়া উঠি, তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না; আমরা হয়ত তাড়াতাড়ি একটু বেড়াইয়া আসিয়া পড়িতে বসি। ঘুম-ভাঙার পরে ঐসব গাছও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। যাহারা মরার মত মাটির তলায় লুকাইয়া ছিল, তাহারাই তখন নূতন পাতা ছাড়িয়া প্রকাণ্ড গাছ হইয়া দাঁড়ায়।

শীতের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে আমড়া, জিউলি, শিমুল, গোলকচাঁপা, বাদাম প্রভৃতি গাছের পাতা ঝরিতে শুরু

করে। তখন একটিও নূতন পাতা গজায় না,—দেখিলে মনে হয়, যেন গাছগুলি মরিয়া গিয়াছে। ইহাও গাছদের আর এক রকমের ঘুম। শীতকাল আসিলেই পাতার সার বস্তু ইহারা গায়ের ছালে জমা করে। তারপর ঠান্ডার ভয়ে শামুকেরা যেমন খোলার মুখ বন্ধ করে, ইহারাও তেমনি একটা কঠিন শুক্‌না ছালে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলে এবং শেষে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। এই রকম ঘুমন্ত গাছের ছাল ছুরি দিয়া কাটিলে দেখা যাইবে—কর্ক বা সোলার মত একটা পুরু আবরণ ইহাদিগকে সত্যই রক্ষা করিতেছে।

আমরা সাধারণত দিনে জাগিয়া রাতে ঘুমাই। এই রকম দিনে-জাগা রাতে-ঘুমানো গাছ যে কত আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। আমলকী, শিরীষ, তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া, বকফুল প্রভৃতি ছোট পাতলা পাতাযুক্ত অনেক গাছই সমস্ত দিন রোদে পুড়িয়া মাটির রস খাইয়া সন্ধ্যার সময়ে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং ঘুম শুরু করে।

লজ্জাবতী যে কেবল লাজুক, তাহা নয়, ছোট খোকার মত সে ক্ষণে ক্ষণে ঘুমাইয়া পড়ে। জুজুর ভয় দেখাইলে আমাদের ছোট খোকাটি যেমন চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকে, ইহারাও সেই রকম ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণচূড়া বা তেঁতুল গাছের ছোট পাতাগুলি দুই-একটি করিয়া জোড় বাঁধিয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি পাতাগুলি এই-রকম জোড়া থাকে এবং ভোরে রৌদ্র উঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলিয়া যায়। তেঁতুল, আমলকী, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি গাছ এক রকমেই ঘুমায়।

জবা, পদ্ম, স্থলপদ্ম, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফুল দিনে জাগিয়া রাত্রিতে ঘুমায়। সমস্ত পদ্ম-পুকুর খুঁজিয়াও রাত্রিতে একটিও ফোটা পদ্মফুল পাওয়া যাইবে না। আবার রজনীগন্ধা, কুমুদ, মল্লিকা, যুঁই, চামেলি, সন্ধ্যামালতী প্রভৃতি রকম-রকম ফুল দিনে ঘুমাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটায়।

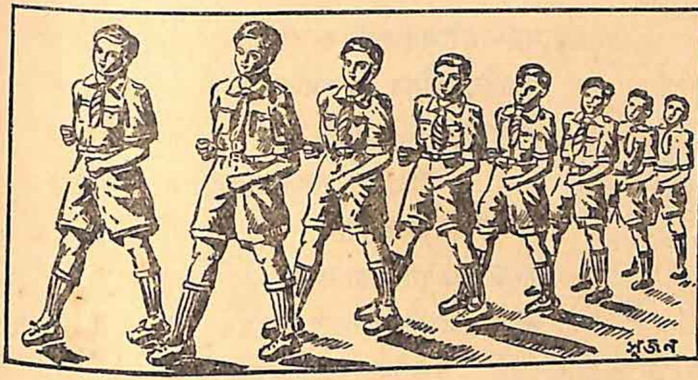
পাকা দোকানদারের মত রঙিন পাপড়ি মেলিয়া লাউ-কুমড়ার ফুল, জবাফুল এবং আরো কত রঙিন ফুল দিনে ফুটিয়া উঠে। শরৎকালের ভোরবেলায় পদ্মবনের ধারে গেলে দেখা যায়—পদ্মবনে যেন মৌমাছি ও প্রজাপতিদের মেলা বসিয়া গিয়াছে। মধু খাইবার জন্য এক ফুল হইতে আর এক ফুলে তাহাদের কত লাফালাফি এবং দৌড়াদৌড়িই চলে। দোকানদার দোকান সাজাইয়া সাইনবোর্ড টাঙাইয়া যেমন খরিদ্দার জোগাড় করে, ফুলেরা রঙিন পাপড়ি মেলিয়া মধু-কোষে মধু জমা রাখিয়া এবং সুন্দর গন্ধ ছড়াইয়া ঠিক সেই রকমেই প্রজাপতি ও ভ্রমরদের ডাকে। খরিদ্দার দোকানে আসিয়া জিনিসপত্র কেনে এবং টাকা দেয়। ভ্রমর মৌমাছির দল ফুলেদের টাকা দেয় না বটে, কিন্তু মধু খাইবার সময়ে এমন একটি উপকার করে যে, তাহার দাম টাকার চেয়েও অনেক বেশি।

এই উপকারটি যে কি, তাহা অনেকেরই জানা নেই। কেবল ফুটিয়া উঠিলেই সব ফুলে ফল হয় না। ফুলের রেণু যদি ফুলের মাঝখানের কেশরে গিয়া না ঠেকে, তবে সে-ফুলে ফল ধরে না। আবার এমনও অনেক ফুল আছে, যাহাদের এক ফুলের রেণু আর একটি ফুলের কেশরে না পড়িলে, ফুল নষ্ট হইয়া

যায়—তাহাতে ফল হয় না। যে-সকল প্রজাপতি ও মৌমাছি মধুর লোভে ও রঙের বাহারে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে আনাগোনা করে, তাহারাই ফুলের রেণু গায়ে-মাথায় মাখিয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বহিয়া লইয়া যায়। ইহাতেই ফুল হইতে ফল হয়। প্রজাপতি প্রভৃতি ফুলেদের এই যে উপকারটি করে, তাহা কি কম উপকার? এই উপকার পাইবার জন্যই সমস্ত দিন পাপড়ি মেলিয়া ও রোদে পুড়িয়া ফুলগুলি হাঁ করিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে। তার পরে যখন সন্ধ্যার সময়ে প্রজাপতির দল এবং মৌমাছির ঝাঁক বাসায় চলিয়া যায়, তখন পাকা দোকানদারের মত ফুলেরা পাপড়ি গুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

[সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত]





তরুণের গান

কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণদল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্ চল্ চল্॥

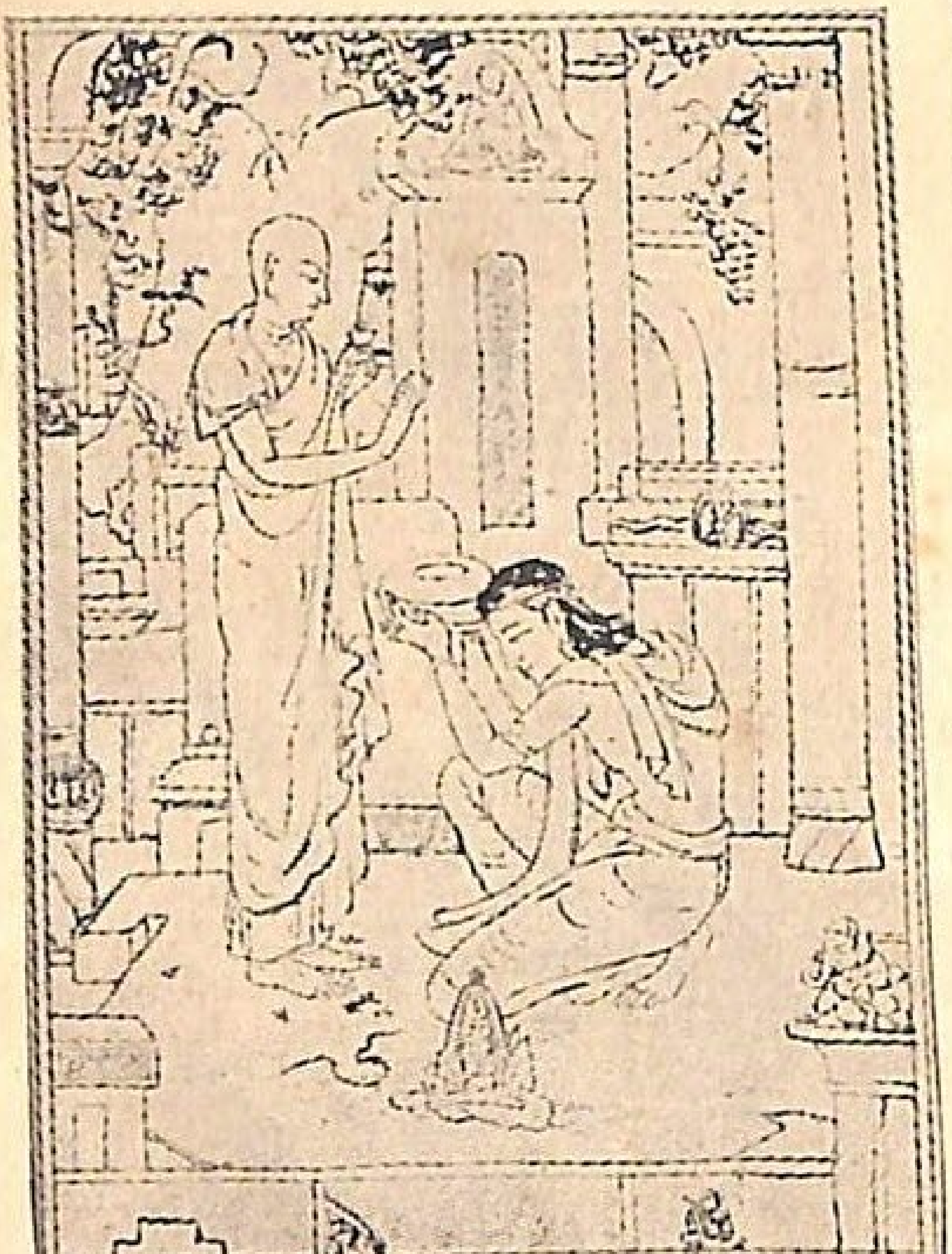
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব-নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চল্‌রে নও-জোয়ান,
শোন্‌রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।
চল্‌ চল্‌ চল্‌॥





অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের অভিলাষ



অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ



অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা

শিল্পী : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম



সম্রাট্ অশোক

নিতাইবিনোদ গোস্বামী

এখনকার পাটনাকে আগে পাটলিপুত্র বলা হত। দু'হাজার বছরের আগে এই পাটলিপুত্র ছিল খুব জমকালো নগর। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সেখানকার রাজা। মায়ের নাম মুরা ছিল বলে' চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য বলা হত। তিনি খুব বিখ্যাত আর শক্তিশালী রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের ছেলে বিন্দুসার। বিন্দুসারের অনেক ছেলে। তার মধ্যে একজনের নাম অশোক। বিন্দুসার মারা গেলে অশোক গায়ের জোরে আর বুদ্ধির জোরে রাজসিংহাসন দখল করে' রাজা হন।

অশোক প্রথমে নিষ্ঠুর আর খামখেয়ালী ছিলেন। তাঁর চেহারা সুশ্রী ছিল না। অশোক আপনাকে ইন্দ্রের সমান মনে করতেন। তবে ইন্দ্রের দখলে শুধু স্বর্গ নয় নরকও আছে, তাঁরই বা তা থাকবে না কেন? কাজেই রাজধানী পাটলিপুত্রে একটি চমৎকার বাড়ি তৈরী করলেন, তার নাম দিলেন—নরক। সেখানে যমদূতের মত ভয়ংকর সব প্রহরী বসে গেল। অশোক তাদের বলে দিলেন—"যে কেউ এ বাড়িতে ঢুকবে, অমনি তাকে দেবে সাবাড় করে।" এই নরকে যে কত লোক শুধু শুধু মারা গেল, তার হিসেব নেই। একদিন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সেই বাড়িতে এসে যেমন ঢুকলেন অমনি প্রহরীগুলো ধরল চেপে, কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রশান্ত চেহারা দেখে তারা তাঁকে না মেরে ফেলে রাজার কাছে খবর দিল। রাজা এলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে নানা ধর্ম-উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—আমরা যখন কাউকে প্রাণ দিতে পারিনে, তখন শুধু শুধু কারও প্রাণ নেওয়াও আমাদের অন্যায়; প্রাণিহত্যা মহাপাপ। রাজার মন নরম হল, সন্ন্যাসীর উপদেশে বৌদ্ধধর্মের দিকে তাঁর মন টানল, তিনি তাঁর নরক ধ্বংস করে ফেললেন।

কিন্তু রাজ্য বাড়াবার দিকে অশোকের ঝোঁক চেপে গেল। এক এক করে ভারতবর্ষের প্রায় সব দেশই তিনি জয় করলেন। এখন তিনি হলেন সম্রাট্ অর্থাৎ রাজাদের রাজা। অশোক তাঁর ছোট ভাই বীতশোককে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। বীতশোক রাজার ছেলে হয়েও সংসারধর্ম না করে জৈন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। প্রাসাদ ছেড়ে চলে এলেন জৈনদের আশ্রমে। একদিন অশোক কোন কারণে চটে গিয়ে হুকুম দিলেন—"কাটো

জৈনদের মাথা।” বীতশোক তা শুনতে পেয়ে আগেই নিজের মাথা কাটিয়ে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাট্ তাঁর প্রিয় ভাইয়ের মুণ্ড দেখে শোকে অভিভূত হয়ে আদেশ ফিরিয়ে নিলেন; জৈনদের দল গেল বেঁচে।

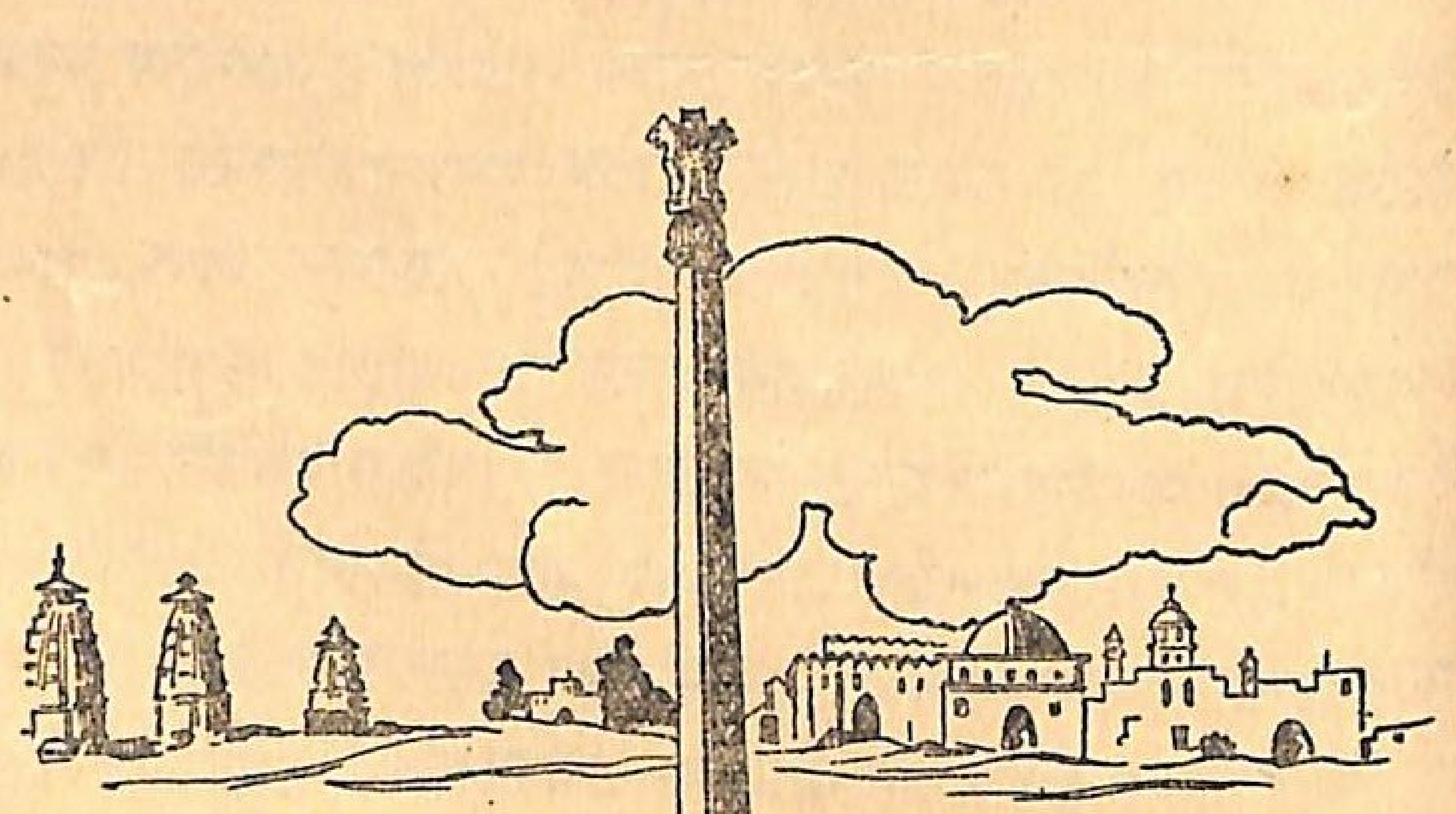
আজকালকার উড়িষ্যাকে আগে বলত কলিঙ্গ। অশোক গেলেন কলিঙ্গ জয় করতে। ভীষণ যুদ্ধ হল। সে-দেশের রাজা গেলেন হেরে। এই যুদ্ধে অশোকের চোখের সামনেই হাজার হাজার লোক মরল। অস্ত্রের আঘাতে জলজ্যান্ত মানুষগুলো গেল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে; ঘরে ঘরে বাপ, ভাই, স্বামী, পুত্রের জন্য হাহাকার উঠল। অশোকের মন গেল একেবারে বদলে। তিনি ফিরে এসে ধর্মের দিকে মন দিলেন।

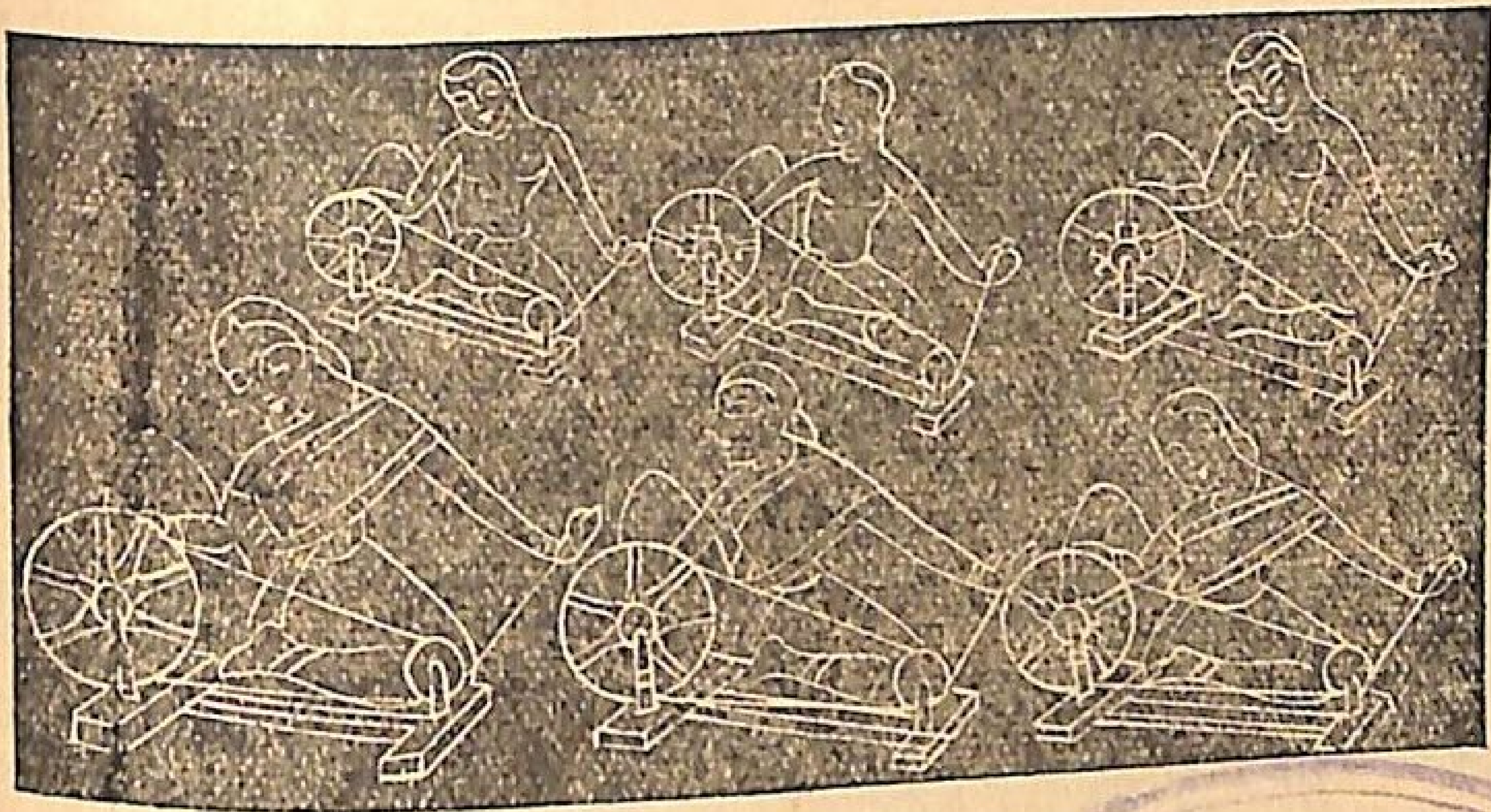
এর পর বৌদ্ধধর্মের যাতে সব রকমে প্রসার হয়, সেই চেষ্টায় লাগলেন। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখিরাও যাতে তাঁর রাজত্বে নির্ভয়ে সুখে বাস করতে পারে তারও ব্যবস্থা করলেন। দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করতে লোক পাঠালেন, এমনকি নিজের ছেলে মহেন্দ্র ও মেয়ে সংঘমিত্রাকে সন্ন্যাসী ক'রে সিংহলে পাঠালেন বৌদ্ধধর্ম শেখাতে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সিংহলীরা বৌদ্ধ। পাহাড়ের গায়ে ও থামের উপরে তিনি উপদেশ ও আদেশ খোদাই করালেন। সারা ভারতবর্ষে এই সব শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি আজও ছড়িয়ে রয়েছে। এসব থেকে অশোকের সম্বন্ধে আমরা অনেক খবর জানতে পাই।

অশোকের প্রধান লক্ষ্য ছিল—অহিংসা। মানুষ যে শুধু মানুষকেই ভালবাসবে তা নয়, চারিপাশে যত পশুপাখি রয়েছে তাদেরও ভালবাসবে। তিনি দানও করতেন কম নয়।

রাজকোষে সোনা-রূপো যা ছিল, সবই তিনি দিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাটির বাসন ব্যবহার করতে হয়েছিল। জগতে এ রকম সম্রাট্ আর হয়নি।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতীক গ্রহণ করা হয়েছে, তা অশোক স্তম্ভ নামে খ্যাত। ত্রিবর্ণচিত্রিত জাতীয় পতাকার মধ্যে যে চক্র দেখতে পাওয়া যায় তাকে অশোক চক্র বলা হয়।





চরকার গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভোমরায় গান গায় চরকায়, শোন ভাই,
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই।
ঘর বার করবার দরকার নাই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার।
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর,
ঘর ঘর ক্ষীর সর আপনায় নির্ভর।
পড়শীর কণ্ঠে জাগল সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

চরকায় সম্পদ, চরকায় অন্ন,
বাঙলার চরকায় ঝলকায় স্বর্ণ।
বাঙলার মসলিন বোগ্‌দাদ রোম চীন,
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।

চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর ঘর,
ঘর ঘর সম্পদ আপনায় নির্ভর।
স্বপ্নের রাজ্যে দৈবের সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

চরকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র,
চরকাই দৈন্যের সংহার-অস্ত্র।
চরকাই সন্তান, চরকাই সম্মান,
চরকাই দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ।
চরকার ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর ঘর,
ঘর ঘর সম্ভ্রম আপনায় নির্ভর।
প্রত্যাশ ছাড়বার জাগল সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

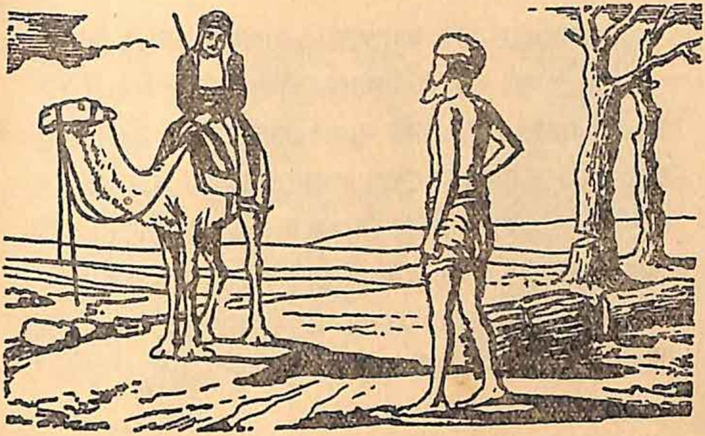
নিঃস্বের মূলধন, রিক্তের সঞ্চয়,
বঙ্গের স্বস্তিক চরকার গাও জয়।
চরকায় দৌলত, চরকায় ইজ্জত,
চরকায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জত।
চরকার ঘর্ঘর গৌড়ের ঘর ঘর,
ঘর ঘর গৌরব আপনায় নির্ভর।
গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

[সংক্ষেপিত]

মন্দিরে যাবেন না, তাই বলে সবাইকে পুরীতে এসেও মন্দির দর্শন না করেই ফিরে যেতে হবে? একি অদ্ভুত আদেশ!

অদ্ভুত বলে মনে হলেও গান্ধীজীর এ আদেশের যথেষ্ট কারণ আছে। দেবতা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া নয়। একজন দৈববশে উচ্চবংশে জন্মেছে বলেই মন্দিরে তার প্রবেশের অধিকার থাকবে, আর অন্যজন নীচবংশে জন্মেছে বলেই মন্দিরে ঢুকতে পাবে না—এ কেমন ব্যবস্থা? মানুষে মানুষে এই ব্যবধান কেন? মানুষের এই অপমান কি তার দেবতার অপমান নয়? যে মন্দিরে ভগবানের প্রিয় সন্তান মানুষকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, অপমান ক'রে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, সে-মন্দিরে গান্ধীজী প্রবেশ করতে চান না এবং তাঁর সঙ্গীদেরও তিনি যেতে দিতে চান না।

আর একবার মহাত্মাজী যাচ্ছিলেন উত্তর প্রদেশের কোন এক শহরের ভিতর দিয়ে। যেতে যেতে মহাত্মাজী চমকে উঠ্লেন—পথের ধারে ও কে! সারা শরীর ক্ষতময়। ক্ষতের উপর মাছি বসছে—মাছিগুলোকে তাড়াবার ক্ষমতাও নেই। এ দৃশ্য মহাত্মাজী সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অস্পৃশ্য কুষ্ঠরোগীকে তুলে বসালেন, নিজের কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিলেন তার ক্ষতস্থানে। মহাত্মাজীর চোখের সামনে ভেসে উঠল সারা ভারতের ছবি। কত কুষ্ঠরোগীই না এমনিভাবে সমাজের অস্পৃশ্য হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। তিনি সংকল্প করলেন এই কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতে। সবরমতী আশ্রমে গড়ে তুললেন এক কুষ্ঠাশ্রম। এই আশ্রমের রোগীদের তিনি নিজের হাতে সেবা-শুশ্রূষা করতেন।



হাতেম-তাই

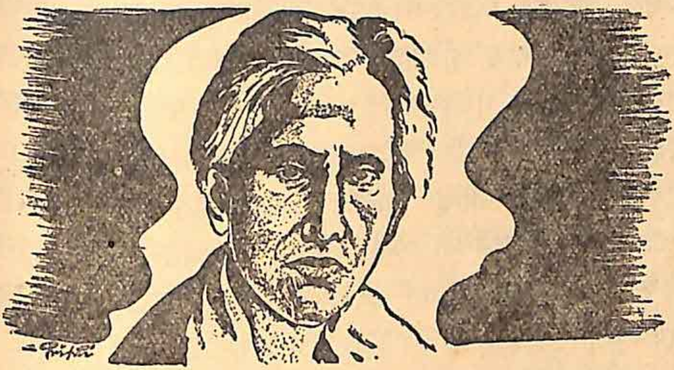
কালিদাস রায়

স্তাবকেরা যবে করিতেছে সবে হাতেমের গুণ-গান,
কহিল হাতেম, "থাম থাম ভাই, ঝালাপালা হল কান;
এই শহরের প্রান্তে রয়েছে মোর চেয়ে ঢের বড়
একজন লোক, বড়ই কাঙ্গাল, তার গুণ-গান করো।
চল্লিশ উট কোরবানি করি ক'রেছিনু আয়োজন
মস্ত ভোজের; অবারিত দ্বার—সবার নিমন্ত্রণ।
আমার বাড়ীতে জুটিল সবাই; করিলাম অনুভব
তৃপ্তি-সুখের সঙ্গে সেদিন বাদশাহী গৌরব।
আসিতেছিলাম উষ্ট্রে চড়িয়া বনের প্রান্ত দিয়া,
দেখিলাম এক কাঙাল বৃদ্ধ কাঠকুটা কুড়াইয়া

জড়ো করিতেছে এক জায়গায়। বলিলাম তারে ডাকি,
হাতেমের বাড়ী বড় খানা আজ, তুমি তাহা জাননা কি?
সবাই গিয়াছে, তুমি যাবে নাক? সেথা আজ নওরোজ,—
চল্লিশ উট কোরবানি সেথা, জমেছে বিরাট ভোজ।
সে বলিল শুধু—খাটিয়া যে পারে জুটাতে পেটের ভাত,
তার কি অভাব? হাতেমের দ্বারে সে কেন পাতিবে হাত?
তার কথা শুনে হইল আমার গর্বের অবসান;
গুণ-গান যদি করিতেই হয়, কর তার গুণ-গান।"

[শেখ সাদী হইতে]





শখের থিয়েটার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সরকারদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পাড়ার শখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইয়াছে। মেঘনাদবধ হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশী চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়া নাই, বিশ্রামও নাই। স্টেজ বাঁধায় সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীন-রুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়তো-বা আমাকে দেখিলে এক-

আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীন-রুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম; রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতেও পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হইয়া গেলে, নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই অপ্রসন্ন হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাঁই, ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপসিন উঠিয়াছে। বোধ করি-বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন —অল্প অল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া

পড়িলেন। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল, ফুটলাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেটবাঁধা কোমরবন্ধটা পটাস করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হই-চই পড়িয়া গেল! তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ-বা সভয়ে চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ-বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল। কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেণ্টুলানের মুট চাপিয়া, ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু, ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপযুক্ত নয়, শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে। অবশেষে তাহাতেই জিত! বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

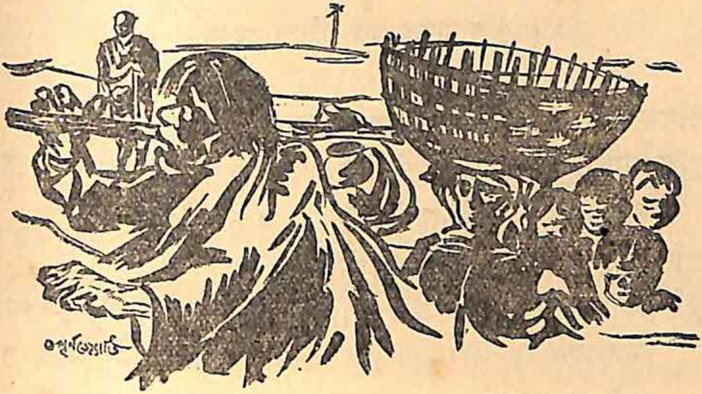


তপ্‌সে মাছ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কষিত কনক কান্তি কমনীয় কায়।
গাল ভরা গোঁপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননির শরীরে॥
পাখি নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস সব-অঙ্গে মাখা॥
একবার রসনায় যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তার॥
দৃশ্য মাত্র সর্বগাত্র প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে ত্রিভুবনময়॥
প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁশ বাছা।
ইচ্ছে করে একেবারে গালে দিই কাঁচা॥
অপরূপ হেরে রূপ সর্ব দুঃখ হরে।
মুখে দেওয়া দূরে যাক্, গন্ধে পেট ভরে॥

[ঈষৎ পরিবর্তিত]



অবাক জলপান

সুকুমার রায়

রাজপথ

[ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ—পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি—উসকো খুসকো চুল—শ্রান্ত চেহারা]

পথিক। নাঃ—একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় একঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তর বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়ত লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও ত লোকজন দেখছিনে!—ঐ একজন আসছে—ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক। মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান দিতে পারি।

পথিক। না, না, আমি তা বলিনি—

ঝুড়িওয়ালা। না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কি না! তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম—

পথিক। না হে জলপাই চাচ্ছিনে।

ঝুড়িওয়ালা। চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' করছেন কেন? খামাকা এ রকম করবার মানে কি?

পথিক। আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি জল চাচ্ছিলাম।

ঝুড়িওয়ালা। জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়—'জলপাই' বলবার দরকার কি? জল আর জলপাই কি এক হ'ল? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছ-রাঙাও তাই? বরকে কি আর আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি আর চালতার খোঁজ করেন?

পথিক। ঘাট হয়েছে মশাই! আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা। অন্যায় ত হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি—তবে জলই-বা চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

পথিক। দেখলে! কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে। যাক, ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

[লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ। কে ও, গোপাল নাকি?

পথিক। আজ্ঞে না, আমি পুব-গাঁয়ের লোক, একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম।

বৃদ্ধ। বল কি হে? পুব-গাঁও ছেড়ে এখানে এয়েছ জলের খোঁজ করতে? হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা, যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকা-া-র জল।

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। তা তো পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন জল তো খাওনি কখনো! বলি ঘুমড়ির জল খেয়েছ কোনদিন?

পথিক। আজ্ঞে না, তা খাইনি—

বৃদ্ধ। খাওনি? আঃ ঘুমড়ি হচ্ছে আমার মামার বাড়ি—আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কি বলব তোমায়! কত জল খেলাম—কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল—কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা--ঠিক যেন ক্যাওড়া দেওয়া শরবৎ!

পথিক। তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় ক'রে রাখুন—আপাতত এই তেষ্টার সময় যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে—

বৃদ্ধ। তা হলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে খেলেই তো পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? যা হয় একটা হলেই হল, ও আবার কি রকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য ক'রে বলবারই বা দরকার কি? আমাদের জল পছন্দ না হয় খেও না—বাস। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি? আমি ওরকম ভালবাসিনে। হ্যাঁঃ...

[রাগে গজ গজ করিতে করিতে প্রস্থান]

[পাশের বাড়ির জানালা খুলিয়া আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহির করণ]

বৃদ্ধ। কি হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক। আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে-কথা কানেই নেন না, কেবলই সাতপাঁচ গপ্‌পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগে মেগে অস্থির।

বৃদ্ধ। আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কি, আর বলবেই বা কি? ওর যে দাদা আছে, খালিপুরে চাকরি করে, সেটা তো একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কি বললে তোমায়?

পথিক। কি জানি মশাই—জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে—

বৃদ্ধ। হুঁ—ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন! আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব—

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল—

বৃদ্ধ। কি বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বৃষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল—রোদে ঘেমে জ—ল, আহ্লাদে গলে জ—ল, গায়ের রক্ত জ—ল, বুঝিয়ে দিলে যেন জ—ল—কটা হল? গোনিনি বুঝি?

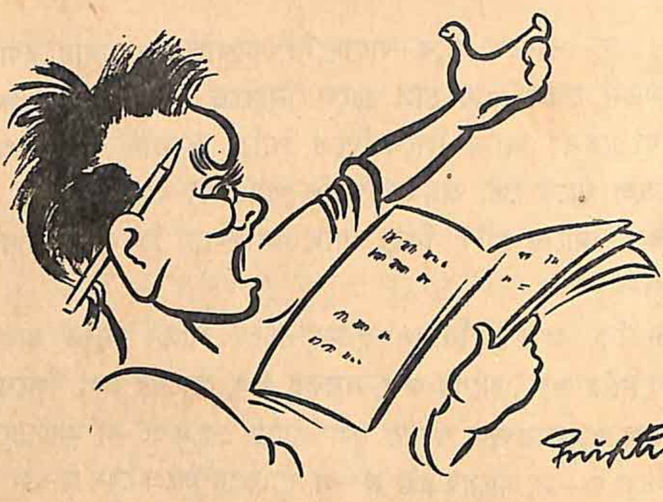
পথিক। না মশাই গুনিনি—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—

বৃদ্ধ। তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও যাও, মেলা বকিও না—একেবারে অপদার্থের একশেষ!

[সশব্দে জানালা বন্ধ]

পথিক। নাঃ আর জলটল চেয়ে কাজ নেই—এগিয়ে যাই, দেখি কোথায়ও পুকুর-টুকুর পাই কি না।...

[সংক্ষেপিত]



নোট বই

সুকুমার রায়

এই দেখ পেনসিল, নোট-বুক এ-হাতে,
এই দেখ ভরা সব কিল্‌বিল্‌ লেখাতে।
ভাল কথা শুনি যেই চট্‌পট্‌ লিখি তায়—
ফড়িঙের কটা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায়;
আঙ্গুলেতে আঠা দিলে কেন লাগে চট্‌চট্‌
কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্‌।
দেখে শিখে প'ড়ে শুনে ব'সে মাথা ঘামিয়ে,
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ।
কান করে কট্‌কট্‌, ফোড়া করে টন্‌টন্‌—
ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন।

কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খট্‌কা,
ঝোলা গুড় কিসে দেয়? সাবান না পট্‌কা?
এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে,
জবাবটা জেনে নেবো মেজদাকে খুঁচিয়ে।
পেট কেন কামড়ায় বল দেখি পার কে?
বল দেখি ঝাঁজ কেন জোয়ানের আরকে?
তেজপাতে তেজ কেন? ঝাল কেন লঙ্কায়?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায়?
কার নাম দুন্দুভি? কাকে বলে অরণি?
বলবে কি, তোমরা ত নোট বই পড়নি!





রথের মেলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল। কিন্তু তাহার পিতা নাই। এক জ্ঞাতির সঙ্গে মোকদ্দমায় হারিয়া গিয়া তাহার মাতা সর্বস্বান্ত হয়। তখন ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বিধবা একটি কুটিরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িত হইল। যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং আহার আর চলে না। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ অসুস্থ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল; কিন্তু পথ্য কোথায়?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয়

করিয়া দুই-একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া সকল লোক চলিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল। অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার, পথ কর্দমময়, পিচ্ছিল—কিছু দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। চলিতে যাইয়া রাধারাণী বারবার আছাড় খাইতেছিল, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। তথাপি সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমন অন্ধকারে অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ ডাকিয়া কাঁদে নাই—এখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ?"

পুরুষ মানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর ক্রন্দন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণী ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখী লোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।"

পুরুষ বলিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

রাধা বলিল, "আমি রথ দেখতে গিয়াছিলাম। বাড়ি যাইব। অন্ধকারে বৃষ্টিতে পথ দেখিতে পাইতেছি না।"

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

রাধা বলিল, "শ্রীরামপুর।"

পুরুষ বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব; কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ি—আমাকে বল—আমি তোমাকে বাড়ি রাখিয়া আসিতেছি। পথ বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর; নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইভাবে সেই ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। পথে সে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি?"

"রাধারাণী।"

"তোমার বয়স কত?"

"দশ এগার বছর—"

"হ্যাঁ, রাধারাণী, তুমি ছেলেমানুষ, একলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?"

তখন সে কথায় কথায় এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল।

তখন সে পুরুষ বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়িতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ তো আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল।

রাধারাণী সে ব্যক্তিকে মালা দিল।

সে বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" এই বলিয়া মূল্য দিল।

রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেকিতেছে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না, দুইটা বই দিই নাই।"

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মায়ের কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি—টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি; তুমি ভিজা কাপড় ছাড়, তারপর প্রদীপ জ্বালাইও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা আমি ভিজা কাপড়ে সর্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিংড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।"

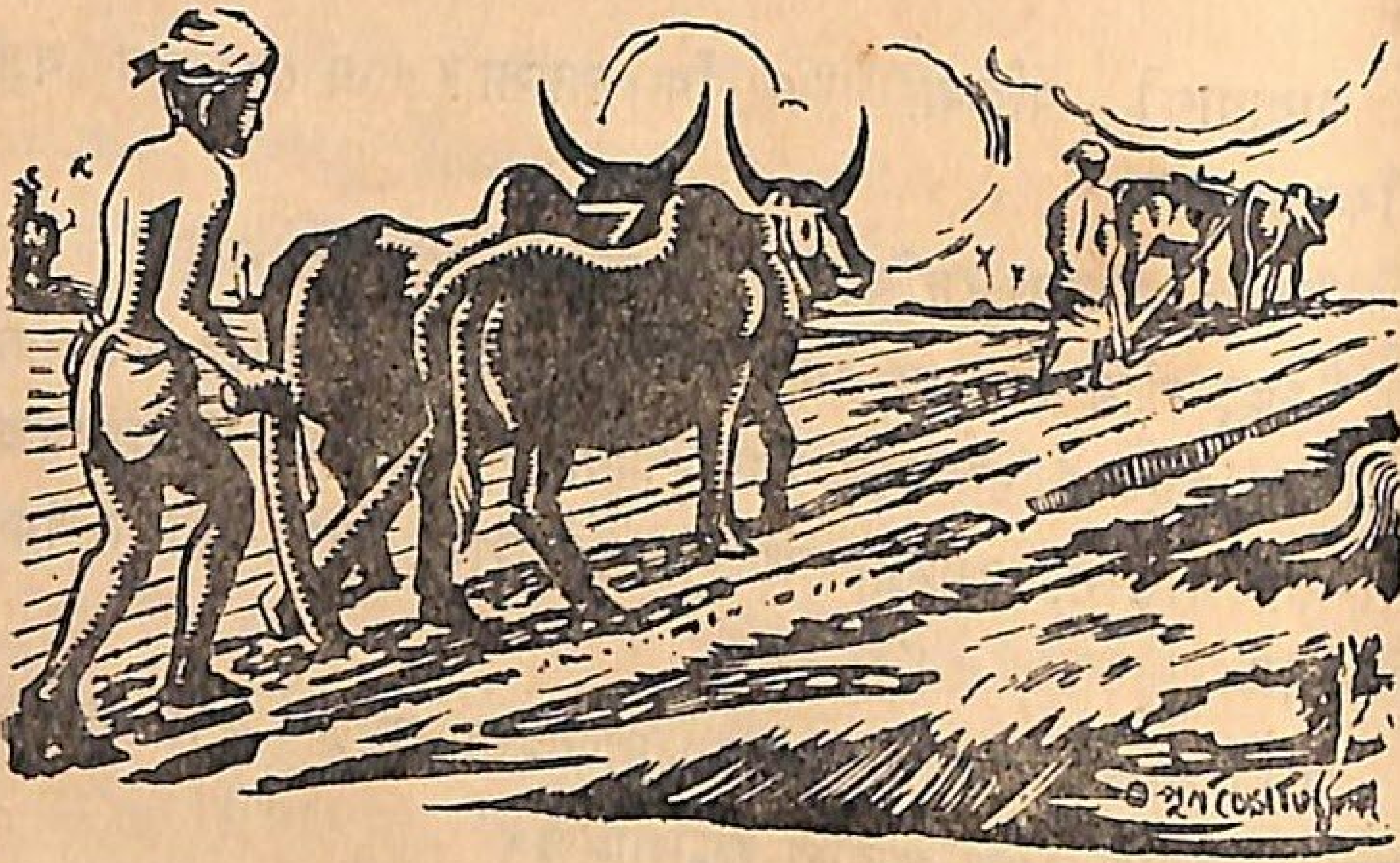
"আচ্ছা।"

আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল—টাকা বটে, পয়সা নহে। তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া দেখিল—যে টাকা দিয়াছে, সে নাই, চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণবদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল, "মা, এখন উপায় কি হইবে?"

মা বলিল, "কি হইবে বাছা! সে কি আর না জানিয়া টাকা দিয়াছে? সে দেবতা; আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে। ভগবান্ তাহার মঙ্গল করুন।"

[সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত]



কৃষিকর্ম

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আমরা প্রতিদিন যাহা খাই, তাহার অধিকাংশ কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন। লোকে নিয়মিত কালে লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূমি খনন করিয়া বীজ বপন করে। গাছ জন্মিলে তাহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করে এবং যাহাতে উহা উত্তমরূপে বাড়িতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দেয়। ফল পাকিলে গাছ কাটিয়া আনে ও ফল পৃথক্ করিয়া লয়। এইরূপ ভূমি খনন, বীজ বপন প্রভৃতি ক্রিয়াকে কৃষিকর্ম বা চাষ বলে। যাহারা কৃষিকর্ম করে, তাহাদের নাম কৃষক বা চাষী।

কৃষিদ্বারা ধান, গম, কলায় প্রভৃতি নানাবিধ শস্য জন্মে। তন্মধ্যে ধান্য হইতে তণ্ডুল, যব হইতে ছাতু, গম হইতে ময়দা, আর ছোলা, মটর, অড়হর, মুগ, মসূর, মাষ প্রভৃতি কলায় হইতে ডাইল হয়। তিল, সর্ষপ প্রভৃতি কতকগুলি শস্য আছে;

তাহা হইতে তৈল পাওয়া যায়। ইক্ষু হইতে গুড়, চিনি, মিছরি হয়। শাক, পটোল, আলু, মূলা, লাউ, কুমড়া, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীও কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়।

কৃষিকর্ম দ্বারা কার্পাস জন্মে। কার্পাসের বীজ পৃথক্ করিলে তূলা হয়; তূলা হইতে সূত্র হয়; সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, আমরা সেই বস্ত্র পরি। অতএব আমাদের পরিধান-বস্ত্রও কৃষিকর্ম দ্বারা লব্ধ হয়।

ফল পাকিলে যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক ও জীবনহীন হয়, তাহাদিগকে ওষধি কহে; যেমন ধান্য, কলাই, লাউ, কুমড়া, কদলী ইত্যাদি। বাঁশও ফুল ফল হইলে মরিয়া যায়। এজন্য লোকে বাঁশের ফুল হওয়া, দোষ মনে করে।

ইদানীং অনেকেই কৃষিকর্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক উহা অতি সম্মানের কার্য। পূর্বকালে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও চাষ করিতে লজ্জিত হইতেন না। আমাদের দেশে ভূমিকে লক্ষ্মী বলে। সুনিয়মে চাষ করিতে পারিলে, অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ধনবান্ হইতে পারে।

কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইলে উদ্ভিদদিগের পুষ্টিসাধনের জন্য কি কি উপায়ের প্রয়োজন হয়, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরাও বায়ু, আলোক, উত্তাপ, জল ও উপযুক্ত খাদ্য ভিন্ন জীবনধারণ করিতে পারে না; অতএব যাহাতে এ সমুদয়ের মধ্যে কোনওটির কিছুমাত্র অভাব না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

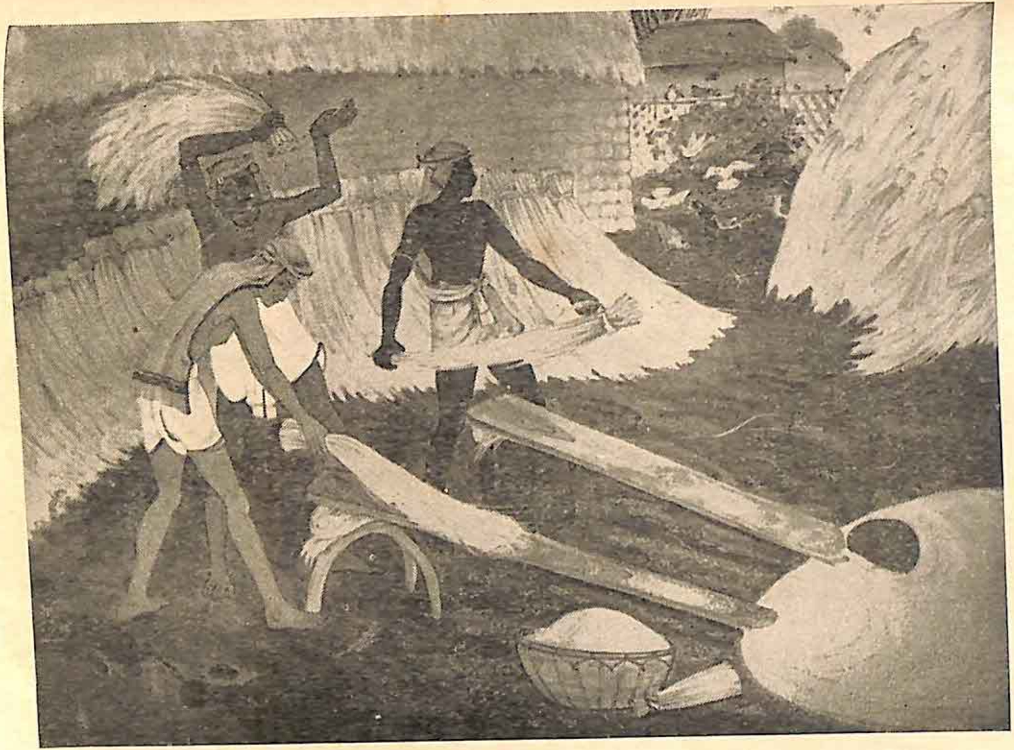
জন্তু সকল যেরূপ প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করে, উদ্ভিদগণও সেইরূপ করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে

না পারিলে যেমন আমাদের রোগ হয়, তেমনই উদ্ভিদগণেরও অপকার হয়। এজন্য বৃক্ষাদি ঘন করিয়া রোপিলে উহারা রীতিমত বাড়িতে পারে না। ঘন করিয়া রোপণ করিবার আরও দোষ আছে। যে ভূমিখণ্ডে দুইটি মাত্র বৃক্ষের উপযুক্ত খাদ্য থাকে তাহাতে চারিটি বৃক্ষ রোপণ করিলে কাহারও প্রচুর আহার হয় না; অতএব তাহারা সকলেই হয় মরিয়া যায়, নয় অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সূর্যের আলোক ও উত্তাপ মনুষ্যের যে পরিমাণে আবশ্যক উদ্ভিদের তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়। লাপ্‌লণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া সূর্যের আলোক ও উত্তাপের অভাব হয়। এজন্য সে দেশে প্রায় কোন বৃক্ষই জন্মে না; যে দুই-এক প্রকার গুল্মাদি দেখা যায়, তাহারা বসন্তের প্রারম্ভে জন্মিয়া গ্রীষ্মের শেষেই মরিয়া যায়।

বৃক্ষের মূলদেশের ভূমি খনন করিয়া, তাহাতে জলসেচন করিলে মৃত্তিকা সরস হয়। মৃত্তিকা সরস হইলে, বৃক্ষগণ অনায়াসেই রস আকর্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে। রবিশস্য অর্থাৎ মটর, যব, গম, প্রভৃতি বর্ষাকালের পরেই বপন করে। তখন ভূমি সরস থাকে; সুতরাং জলসেচনের আর প্রয়োজন হয় না।

যে ভূমিতে শস্যাদির প্রচুর পরিমাণে খাদ্য থাকে, তাহাকে উর্বরা ভূমি বলে। সকল শস্যের খাদ্য ঠিক একরূপ নহে; কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ উদ্ভিদের খাদ্য যথেষ্ট আছে, ইহা বুঝিয়া চাষ করিতে পারিলে অধিক ফল লাভ হয়। এক ভূমিতে বারংবার একই শস্যের চাষ করিলে, ক্রমে শস্যের যে খাদ্য, তাহা



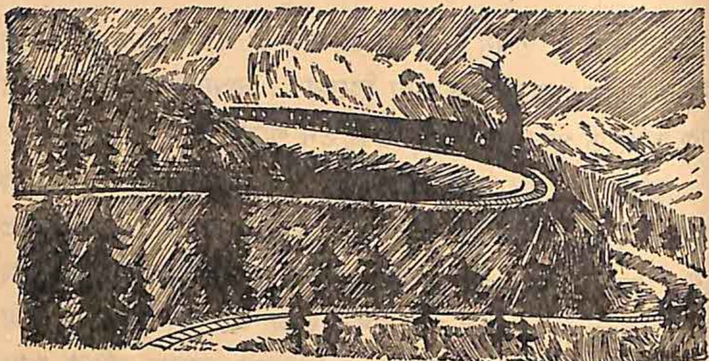
সোনার ফসল		শিল্পী : সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুরাইয়া যায়। তখন আর সে জমিতে ঐ শস্যের চাষ না করিয়া অপর কোন শস্যের চাষ করা বিধেয়। এজন্য বিচক্ষণ কৃষকেরা এক ভূমিতে প্রতিবৎসর নূতন নূতন শস্যের চাষ করিয়া থাকে।

ভূমির উর্বরতা হ্রাস হইয়া আসিলে অথবা কোনও ভূমিকে শস্য বিশেষের উপযোগী করিতে হইলে তাহাতে সার দিতে হয়। পচা গোবর, পচা পাতা, খইল, চুণ ইত্যাদি ভূমির উত্তম সার। বিলাতের ভূমি বঙ্গদেশের ভূমি অপেক্ষা কোনও ক্রমে উর্বরা নহে, অথচ সার দিবার পারিপাট্যে অনেক অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

নিম্নভূমিতে সার দিবার প্রয়োজন হয় না। বর্ষাকালে মৃত্তিকাদি বহন করিয়া, নানা দিক্ হইতে ঐ সকল ক্ষেত্রে জল আসিয়া পড়ে। এই জল কিছুকাল স্থিত হইলেই, মৃত্তিকাদি নীচে পড়িয়া যায়; উহাকেই পলি বলে। নদীতে বন্যা হইলে নিকটবর্তী নিম্নভূমিতে এইরূপ পলি পড়ে এবং ভূমির উর্বরতা বাড়াইয়া দেয়।





দার্জিলিং ভ্রমণ

জলধর সেন

দার্জিলিংএ যাইতে হইলে শিলিগুড়ি পঁহুছিয়া গাড়ী বদল করিতে হয়। এখান হইতে দার্জিলিংএ যে গাড়ী যায় সেগুলি ছোট ছোট ট্রামগাড়ীর মত; তাহাতে ভাল করিয়া বসিবার সুবিধা নাই, বাক্স, পেটরা রাখা তো দূরের কথা! যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সুখ্না স্টেশন পর্যন্ত সমভূমি, সেখান হইতে উপরে উঠিতে হয়। ছোট একখানা এঞ্জিন বীরদর্পে গাড়ীগুলি লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছে—ঠিক যেন একটি পিঁপড়ার সারি। গাড়ী হইতে মাথার উপরে একটা রেল দেখা যাইতেছে সেইখানে যাইতে হইবে, কিন্তু পনের মিনিট ঘুরিয়া সেখানে উঁচুস্তরে উপস্থিত হইতে হইবে। রাস্তায় সর্বসমেত এইরকম পাঁচটা 'লুপ' বা ঘুরপাক আছে।

আমরা ক্রমে যেন স্বর্গে উঠিতে লাগিলাম। সমতলভূমি ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। পাহাড়ের উপরে যতই উঠিতে লাগিলাম ততই উন্নত বৃক্ষশ্রেণী এবং অসংখ্য ফার্নের বন দেখা যাইতে লাগিল। কোথাও পাহাড়ের গায়ে ঝর্ণাধারা, কোথাও শ্যামল শৈবাল।

অনেক স্টেশন পার হইয়া চলিলাম। তিনদরিয়া স্টেশন দার্জিলিং রেলওয়ের কারখানা। তিনদরিয়া হইতে নীচে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়—অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। আত্মীয়-স্বজনকে চোখ ভরিয়া দেখাইতে সাধ হয়। মনে হয়, আমি একা এ সৌন্দর্য ভোগ করিবার অধিকারী নহি। যতই নূতন স্টেশন ছাড়াইতে লাগিলাম ততই নব নব দৃশ্য, অভিনব শোভা, বিচিত্র গাছ, লতাপাতা, বাড়ি, বাড়িতে উঠিবার পথ, দেখা যাইতে লাগিল।

মধ্যপথ ছাড়াইয়া গাড়ী কার্শিয়ং স্টেশনে আসিল। স্টেশনটা খুব জাঁকাল। পাহাড়ের উপরে নানা আকারের অনেক বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এ যেন অলকাপুরী।

কার্শিয়ং স্টেশন হইতে আবার ট্রেন ছাড়িল। গাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশই উপরে উঠিতেছে। বেশ রৌদ্র আছে, কিন্তু বেলা যতই কমিতেছে শীত ততই বাড়িতেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে দেহে ঘাম ছুটিতেছিল, গায়ে পাতলা চাদর রাখা ভার; আর ইহারই মধ্যে শীতে কম্প উপস্থিত! সমস্ত শীতবস্ত্রগুলি আঁটিয়াও মনে হইতেছে, আরও কিছু হইলে সুবিধা হইত। যতই উপরে উঠিতেছি ততই বেশী ঠাণ্ডা। চারিদিক স্তব্ধ, কোথাও কোন শব্দ নাই, শুধু এঞ্জিনখানা গর্জন করিয়া

চলিতেছে—দূরে ধূসর পর্বতশ্রেণী, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তাহার পরে শৃঙ্গ—অসংখ্য শৃঙ্গ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মাথার উপরে শুভ্র জমাট বরফের স্তূপ—তাহার উপরে অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি পড়িয়া চিকচিক করিতেছে।

ঘুম স্টেশন পর্যন্ত উঠিয়া গাড়ী আবার নীচে নামিতে লাগিল এবং আমরা দার্জিলিংএ আসিয়া হাজির হইলাম। যেন আর বেশী বেলা নাই, চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন। এ গরমের সময় এমন কুয়াশা সমতল প্রদেশে অন্তত বাঙ্‌লা দেশের কোথাও দেখা যায় না।

দুর্গম পাহাড়ের বুকে পাথর কাটিয়া তাহার উপর রেল বসাইয়া মানুষ যে সমতলক্ষেত্র হইতে ছয় হাজার ফুট উপরে আসিয়া এমন সুন্দর শহর স্থাপন করিয়াছে, এই কীর্তি দেখিয়া মনুষ্য-জীবন ধন্য বলিয়া মনে হইল।

["পথিক" হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত]





রোগীর সেবা

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

যে বাড়িতে রোগীর সেবা ভাল না হয় সে বাড়ি ভাল নয়। সে বাড়িতে স্নেহমমতা কম, স্বার্থপরতা বেশি, বিলাসিতা অধিক। সে বাড়ির স্ত্রী-পুরুষেরা কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

যে বাড়িতে রোগীর সেবা ভাল হয় সে বাড়ির অনেকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

১। সে বাড়িতে এমন কতক জিনিস দেখিতে পাওয়া যায় যাহা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং প্রয়োজনীয়; যেমন জলগরমের পাত্র, কাপড়ের টুকরা, মাপের গ্লাস, বেডপ্যান, থার্মোমিটার (তাপমান যন্ত্র)।

২। সে বাড়িতে যদি কোন কঠিন পীড়া হয় তবে বয়স্ক ব্যক্তিরা সাহেবী চালে মস্‌মস্‌ করিয়া চলেন না—ছেলেরাও আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলে।

৩। পাহারা যেরূপ নিয়মিতভাবে বদল হয়, রোগীর নিকট

থাকিবার জন্য সেইরূপ দিনে ও রাত্রিতে স্ত্রী এবং পুরুষদিগের বদল হইয়া থাকে।

৪। রোগীর পথ্য এবং ঔষধ সময়মত দেওয়া হইতে থাকে, কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে না।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। গোশালায় একটা গরু রুগ্ন হইয়া পড়িলে যে গরু তাহাকে দেখিতে পায় সেই লেজ তুলিয়া দৌড়াইতে চায়। ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, ছাগল, ভেড়া, ময়না, টিয়া প্রভৃতি সকল পশুপক্ষীরই এই ব্যবহার। প্রায় কেহই পীড়িতের নিকটে যায় না বা তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে না। অতএব রোগীর সেবা পশুধর্মের বিপরীত কাজ। যে মানুষদের মধ্যে পশুভাব যত অল্প তাহারাই রোগীর সেবায় তত অধিক যত্ন করে। রোগীর সেবা যিনি করিবেন তাঁহাকে ভীত বা অধীর হইলে চলিবে না। যাহাতে রোগী ভয় পায় শুশ্রূষাকারীর এমন কোন কাজ করিতে নাই।

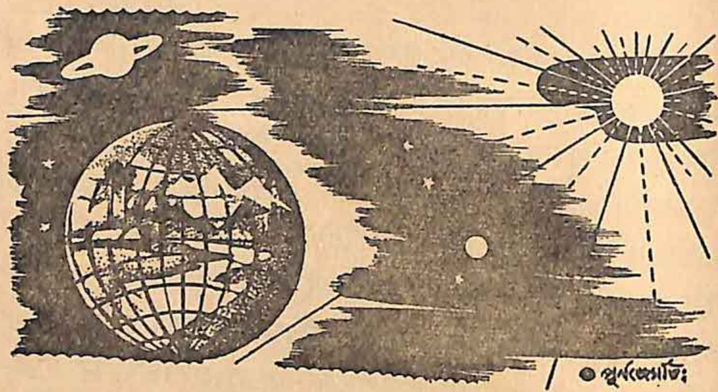
তবে কি রোগীর নিকট হাস্য-কৌতুক করিয়া দেখাইবে যে আমি তাহার পীড়ায় ভীত হই নাই? যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা, তাহার ফলও উত্তম হইতে পারে না। রোগী কৃত্রিম ব্যবহারে বিরক্ত হইবে বা তাহাতে যোগ দিতে গিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিম কার্যও ভাল নহে।

রোগীর সেবক সর্বদা রোগীর প্রতি মনোযোগী হইয়া থাকিবেন—তাহার কি কষ্ট হইতেছে, বিনা কথায় বা বিনা ইঙ্গিতেও, তাহা বুঝিবেন এবং সেই কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে তাহা করিবেন। স্বয়ং ধীর শান্ত হইয়া পীড়িত-রূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

পীড়িতের সেবক এবং দেবতার সাধকের মধ্যে অনেকটা মিল আছে। সাধককে স্থির হইয়া থাকিতে হয়। চুলবুলে লোকেরা, যাহারা সর্বদা এপাশ ওপাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চল-দৃষ্টি হইতে হয়, রোগীর সেবককেও রোগীর প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিতে হয়। যে সেবক-সেবিকাতে সাধকের গুণ থাকে তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগী প্রফুল্ল হয়। তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন—একটু জল চাই, কি দুই-চারিটি ডালিমের দানা চাই—গায়ের চাদরটা একটু পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে—বালিশটা একটু উঁচু করিয়া দিতে হইবে, ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে—শীতল হাতটি কপালে দিতে হইবে, ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন, রোগীর মুখে মৃদু হাসির আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হন।

গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন যেন পীড়িতের বিছানা, বালিশ, কাপড়, চাদর বাড়ির অপর কাহারও বিছানা বা কাপড়ের সহিত না মিশে, রোগীর ব্যবহারের পাত্রগুলি বাড়ির সাধারণ পাত্র-সকল হইতে পৃথক্ থাকে। আর, রোগীর সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে রোগীর ঘরে থাকেন সে কাপড় না ছাড়িয়া বাড়ির অপর লোকের বিশেষত বালক-বালিকাদের সংস্রবে না আসেন। ডাগরদিগের পীড়া ছোটদিগকে যত ধরে, ছোটর পীড়া ডাগরকে তত ধরে না।

["পারিবারিক প্রবন্ধ" হইতে পরিবর্তিত আকারে গৃহীত]



ব্রহ্মাণ্ড

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ছোট ছেলে যেমন মনে করে যে পৃথিবী স্থির আছে, সূর্য আর আকাশের ওই দীপগুলি তার চারদিকে ঘোরে, আগের দিনের মানুষও সেই রকম ভাবত। তারপর কেউ কেউ অন্য রকমের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা বললেন, আকাশে সূর্য স্থির আছে, ওই দীপগুলোও স্থির আছে, ঘুরছে আমাদের পৃথিবী—একটা লাট্টু যেমন ঘোরে, সেই রকম। তাঁরা বললেন, পৃথিবীর এই রকম ঘোরার জন্যে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হচ্ছে। আমাদের দেশে আর্যভট্ট প্রথম এই কথা বলেছিলেন, তারপর অন্য দেশের কোপারনিকাস ও অপর দু-একজন লোকও এই রকম বললেন। এঁদের কথা কেউ কেউ মেনে নিল, অনেকে নিল না।

তিন-শ’ বছরেরও কিছু আগেকার কথা, গ্যালিলিও এক দূরবীন তৈরী করলেন। এ এক আশ্চর্য যন্ত্র। এ দিয়ে দেখলে খুব দূরের জিনিস একেবারে কাছের গোড়ায় দেখায়, বড় দেখায়, অনেক জিনিস যা খালি চোখে দেখা যায় না, এ দিয়ে তা ধরা পড়ে। এই দূরবীন দিয়ে দেখতে দেখতে আকাশে অনেক নতুন নতুন জিনিস লক্ষ্য করা হল, নতুন নতুন কথা জানা গেল, এখন আর কোন সন্দেহই রইল না যে পৃথিবী একটা লাট্টুর মতোই পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে, আর—সূর্য স্থির।

আরও একটা ব্যাপার জানা গেল। জানা গেল যে পৃথিবী শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে না, পাক খেতে খেতে সে সূর্যের চারিদিকেও ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা পাক খেতে তার লাগে এক দিন, আর সূর্যের চারদিকে তার ঘুরে আসতে লাগে প্রায় ৩৬৫ দিন। এইটে হল আমাদের বছর। কি করে জানা গেল ? উপায়টি খুব সোজা। আজ আকাশে যখন একটা নক্ষত্র উঠল, তখন যদি সময়টা দেখে রাখি, কাল দেখব সেটা ৪ মিনিট আগে উঠেছে, আর তারপর দিন আরও ৪ মিনিট আগে। এমনি করে যখন দেখব সেই নক্ষত্রটি আবার প্রথম দিনকার সময়েই আকাশে উঠল, তখন ৩৬৫ দিন কেটে গেছে। কাজেই জানা গেল বছরে ৩৬৫ দিন। কিন্তু কি মজাটাই চলেছে, ৩৬৫ দিনে আমরা কত কোটি মাইল ঘুরে আসছি, টিকিট কিনতে হয় না, পয়সা লাগে না। তবে একটু মুশকিলও আছে,—থামতে বললে থামবে না, চিরদিন একইভাবে চলতে থাকবে। অবশ্য থামলে বিপদ ঘটত, আমরা কোথায় যে ছিটকে যেতুম তার ঠিক নেই।

সূর্যের চারদিকে ঘুরছে পৃথিবী আর অন্য কয়েকটি গ্রহ। সূর্যের সব-কাছের গ্রহ হল বুধ, ক্রমে পর পর আছে শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস, নেপচুন ও প্লুটো। এ-সব ছাড়া মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে প্রায় বার শত গ্রহ-কণা আছে।

দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সব-কাছের গ্রহ হল এক দিকে শুক্র, অন্য দিকে মঙ্গল। শুক্র অপেক্ষা মঙ্গল আরও কাছে।

পৃথিবীর চেয়ে বড় গ্রহ আছে, ছোটও আছে। সবচেয়ে বড় হল বৃহস্পতি। আয়তনে এ পৃথিবীর প্রায় ১৩০০ গুণ বড়।

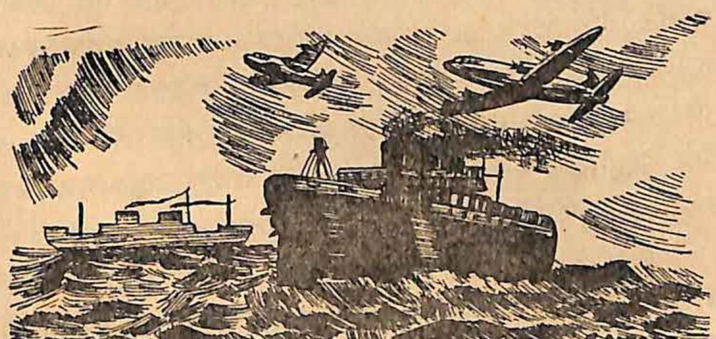
পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে। পৃথিবীর চেয়ে যারা সূর্যের কাছে রয়েছে তাদের ঘুরতে আরও কম সময় লাগে, বুধের লাগে ৪৪ দিন, শুক্রের ২২৫ দিন। অন্য দিকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে যে প্লুটো, সে আমাদের ২৫০ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

সূর্য থেকে গ্রহরা কত কত দূরে আছে, তার হিসেব হয়েছে। দেখা গেছে, ওই সব দূরত্বের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, একটা নিয়ম আছে।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ আছে, প্রাণী আছে। অন্য গ্রহতে কি তারা আছে? যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাতে বলা যায় যে পৃথিবী ছাড়া আর কোন গ্রহে আমাদের এখানকার মতো উদ্ভিদ ও প্রাণী নেই। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, মঙ্গল গ্রহে জীব আছে। যদি-বা থাকে, সেখানে গোলাপ ফুল ফোটে না, কোকিল ডাকে না, ময়ূর পেখম নাচায় না, আর মানুষের

মতো জীব মাথা খাটিয়ে এই বিশ্বের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত নেই। সেখানকার জল-হাওয়ায় যে-রকম জীব থাকা সম্ভব সেই রকম জীবই আছে, এখানকার মতো জীব নেই। টান কম বলে' হাওয়া যদি-বা থাকে, খুব পাতলা হয়ে আছে। পৃথিবীর গৌরব তার আয়তনে নয়, কারণ তার চেয়েও বড় গ্রহ আছে। সে সূর্যের চারদিকে সেকেণ্ডে ১৮ মাইল বেগে ঘুরছে, অন্য গ্রহও আছে যার বেগ এর চেয়েও বেশি। পৃথিবীর গৌরব তার অধিবাসীদের নিয়ে।

["বিজ্ঞান প্রবেশ" হইতে গৃহীত]





সভ্যতা

শ্রীজওহরলাল নেহের্

সভ্যতা অর্থে কি বুঝব? অভিধান খুঁজলে দেখা যাবে সভ্য হওয়া মানে উন্নত হওয়া, মার্জিত হওয়া, অভদ্র রীতি-নীতির পরিবর্তে ভদ্র আচার গ্রহণ করা। আর এই সভ্যতা শব্দটি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয় কোন সমাজ অথবা কতকগুলি দলবদ্ধ লোক সম্বন্ধে। যে অসভ্য অবস্থায় মানুষ প্রায় পশুর মতো জীবন যাপন করে, তাকে বলা হয় বর্বরতা। এর ঠিক উল্টো অবস্থাটাই সভ্যতা। বর্বর অবস্থা থেকে যত উন্নত হওয়া যায়, ততই আমরা সভ্যতার পথেও এগিয়ে যাই।

কিন্তু আসল কথা, কেমন ক'রে বুঝব কোনো একজন মানুষ অথবা কোনো একটা সমাজ বর্বর কি সভ্য? ইওরোপের অনেক লোকই তো মনে করে তারা নিজেরা খুব সভ্য, আর

এশিয়ার যত লোক সব অসভ্য, বর্বর। হয়তো, এশিয়া ও আফ্রিকার লোকদের চেয়ে ইওরোপের লোকেরা বেশী কাপড়-চোপড় ব্যবহার করে বলেই তাদের এই ধারণা। কিন্তু কাপড়-চোপড় পরবার রকমটা তো নির্ভর করে দেশ আর আবহাওয়ার উপর। ঠান্ডা দেশের লোকেরা গরম দেশের লোকদের চেয়ে বেশী কাপড় পরে। অথবা, কে জানে এ-ও হ'তে পারে যে তারা বেশী শক্তিশালী বলেই নিজেদের বেশী সভ্য মনে করে। যে শক্তিশালী, তাকে সভ্য বলে স্বীকার না করা তো দুর্বলের পক্ষে খুব ভয়ের কারণ,—বন্দুকধারীর কাছে প্রাণের মায়াটা তো করতে হয়।

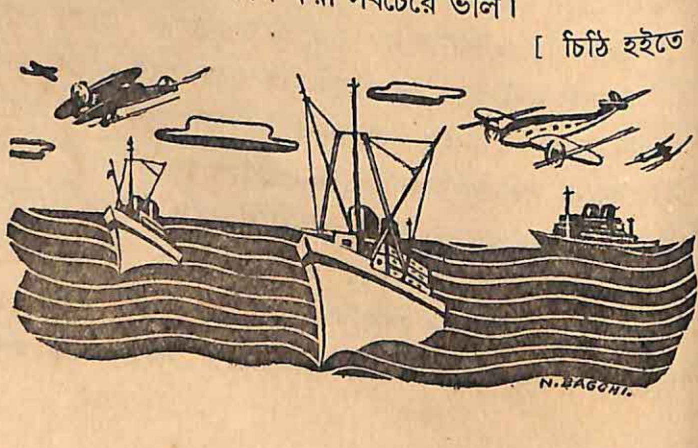
অল্প কয়েক বছর আগে ইওরোপে একটা ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবীর অনেক জাতিই এ যুদ্ধে নেমেছিল, আর প্রত্যেকেরই চেষ্টা ছিল, অপর পক্ষের কত লোককে হত্যা ক'রতে পারে। ইংরেজ তো তার যথাসাধ্য জার্মানদের হত্যা করবার সুযোগ পেয়েছিল; আর জার্মানরাও ইংরেজদের হত্যা করতে কসুর করেনি। লক্ষ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে হত হয়েছে, আর বহু-সহস্র লোক চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে রয়েছে। কারো কারো দুটি চোখই নষ্ট হয়ে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, কারো হাত নেই কারো-বা পা নেই। এরকমভাবে পরস্পরকে হত্যা করার মধ্যে কোনো সভ্যতা অথবা বুদ্ধির প্রকাশ পেয়েছিল? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজনে ঝগড়া করলে পুলিশে এসে তাদের ছাড়িয়ে দেয়; লোকে তো মনে করে তাদের মূর্খ। কিন্তু ভেবে দেখ তো দুটো গোটা দেশ আর জাতির পক্ষে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করা, আর সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ

লোকের প্রাণ বধ করা আরো কত বড় বোকামি, আর কত বড় মূর্খতা। এ যেন জঙ্গলের ভিতর দুটো বুনো লোকের লড়াই। বন্যলোকদের বলা হয় বর্বর, কিন্তু যে-সব জাতি ঠিক এমনিভাবেই বিরোধ করে, তাদেরই-বা এর বেশী আর কি বলা যায়?

কাজেই প্রশ্নটা এদিক থেকে বিচার করে' দেখলে দেখা যায় গত যুদ্ধে ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি এবং অন্যান্য যে-সব জাতি খুন আর লড়াই করেছে, তাদের কেউই সভ্য নয়। কিন্তু আবার এ কথাও খুবই সত্য, এ-সব দেশেই কত সুন্দর জিনিস আছে, আর কত সব মহৎ লোকও রয়েছেন।

সভ্যতার অর্থ বোঝা কঠিন। তা সত্য, এ একটা কঠিন প্রশ্নই বটে। সুন্দর সুন্দর বাড়ি, সুন্দর সুন্দর ছবি, ভালো ভালো বই এবং যা কিছু সুন্দর সুচারু সবই সভ্যতার লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চেয়েও ভাল লক্ষণ হচ্ছে স্বার্থলেশশূন্য মহৎ মানুষ, যিনি সর্বলোকের হিতার্থে সকলের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। একা একা কাজ করা ভাল, কিন্তু সকলের হিতের জন্য একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা সবচেয়ে ভাল।

[চিঠি হইতে]





জাতীয় সংগীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী।

পূরব পশ্চিমে আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,—
হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরি ভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

গণিত

দ্বিতীয় ভাগ

(চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য)

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
রাইটার্স্ বিল্ডিংস্
কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৫৪

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

ভূমিকা

অঙ্ক শিক্ষায় সাধারণতঃ জোর দেওয়া হয় কয়েকটি নিয়ম আয়ত্ত করার উপরে। নিয়মগুলি আয়ত্ত করিয়া যন্ত্রের মত শিশু অঙ্ক কষিয়া থাকে। এই অঙ্কগুলি শিখিবার কি উদ্দেশ্য—জীবনযাত্রার সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক—তাহা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। ফলে অধিকাংশ শিশুর নিকট, বিশেষতঃ যাহাদের বুদ্ধি সেরূপ তীক্ষ্ন নয়—অঙ্ক বিষয়টি নিতান্ত একঘেয়ে অপ্রীতিকর মনে হয়—শিশু অঙ্ক কষিতে মোটেই আগ্রহান্বিত বোধ করে না। অঙ্ক মানে সে বোঝে কয়েকটি সংখ্যার শুধু অর্থহীন খেলা।

অঙ্কে শিশুর আগ্রহ জন্মাইতে হইলে অঙ্ককে জগতের বিষয়বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া না দেখিয়া দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা এবং কার্যকলাপের ভিতর দিয়া শিখাইতে হইবে। দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপের ভিতর দিয়া শিখিলে সে বুঝিতে পারিবে যে জীবন-যাত্রার সঙ্গে অঙ্ক শিখিবার সম্পর্ক রহিয়াছে—ইহা অর্থহীন যন্ত্রচালনার মত কাজ অথবা শুধু কতকগুলি নিয়ম আয়ত্ত করা নয়।

সুতরাং কোনও নূতন নিয়ম শিখাইতে হইলে তাহা তাহার দৈনন্দিন জীবনের কাজের ভিতর দিয়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং তাহাতে সে ঐ নিয়ম শিখিবার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বুঝিতে পারিবে। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে এইরূপ কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় কর্মকেন্দ্রিক। সুতরাং আশা করা যায় সেখানে শিক্ষক মহাশয় কৌশল সহকারে এমন অনেক কাজের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন যাহাতে অঙ্ক শিখিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকিবে।

প্রথম অধ্যায়

পূর্বপাঠের পুনরালোচনা

তোমরা এখন সংখ্যা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছ, তোমরা বুঝিয়াছ যে আমরা দশ দশ করিয়া গুণিয়া থাকি। যদি তাহা না গুণিতাম, তাহা হইলে ১ হইতে ৯ পর্যন্ত এই নয়টি অঙ্ক ও শূন্য দিয়া আমাদের কাজ চলিতে পারিত না। যত সংখ্যা তত অঙ্ক হইত; সে সব মনে রাখা সম্ভব হইত না। প্রাচীনকালের কোন মহামনীষী এই দশের প্রথায় অঙ্ক পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র।

এক হইতে নয় পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ অঙ্কগুলির দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তারপর যেমন দশ হইল, অমনি ১এর পর ০ দিয়া ১০ লেখা হইল। পরে যেমন এক এক করিয়া বাড়িতে লাগিল, তেমনই ১১, ১২, ১৩ হইতে ১৯ পর্যন্ত লেখা হইল। যেমন ২টি দশ হইল অমনি ২এর পর ০ বসিয়া হইল ২০; এইরূপে দুই অঙ্ক দ্বারা আমরা নিরানব্বই পর্যন্ত লিখিলাম। নিরানব্বই = নয় দশ + নয়; ইহার পর সংখ্যা হইল দশ দশ। তাহা ১এর পর দুইটি ০ দ্বারা লেখা হইল; ইহার নাম হইল একশত। ইহার পর ৩টি অঙ্ক লইয়া আমরা নয়শত নিরানব্বই পর্যন্ত লিখিতে পারি। নয়শত নিরানব্বই = নয়শত + নয়দশ + নয়। ইহার পরের সংখ্যা হইবে নয়শত + দশ দশ = নয়শত + একশত = দশশত = এক হাজার; ইহা ১এর পর ৩টি ০ শূন্য দিয়া লেখা হয়। ইহার পর বাড়াইতে বাড়াইতে আমরা পাই দশ হাজার ১0,000। পাঁচ অঙ্কের সব চেয়ে বড় সংখ্যা ৯৯৯৯৯—নিরানব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বই। ইহার পরের সংখ্যা হইবে ১ লক্ষ—১00000। আরও বড় বড় সংখ্যার কথা তোমরা পরে শিখিবে।

নীচের নক্সা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে, ১ হইতে লক্ষ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি কিভাবে লেখা হয়—

লক্ষ	দশ হাজার	দশ শত ॥ হাজার	দশ দশ ॥ শতক	দশ একক ॥ দশক	একক	সংখ্যা
					১	এক
					২	দুই
					৯	নয়
				১	০	দশ
				১	১	এগার
				১	৯	উনিশ
				২	০	কুড়ি
				২	৯	উনত্রিশ
				৩	০	ত্রিশ
				৯	৯	নিরানব্বই
			১	০	০	একশত
			১	০	১	একশত এক
			১	১	০	একশত দশ
			১	৯	৯	একশত নিরানব্বই
			২	০	০	দুইশত
			৮	০	০	আটশত
			৯	৯	৯	নয়শত নিরানব্বই
		১	০	০	০	এক হাজার
		১	০	০	১	এক হাজার এক
		১	০	১	৯	এক হাজার উনিশ
		১	১	৯	৯	এক হাজার একশত নিরানব্বই
		২	০	০	০	দুই হাজার
		৯	৯	৯	৯	নয় হাজার নয়শত নিরানব্বই
	১	০	০	০	০	দশ হাজার
	১	০	০	০	১	দশ হাজার এক
	৩	৪	৫	৬	৭	চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতষট্টি
	৯	৯	৯	৯	৯	নিরানব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বই
১	০	০	০	০	০	এক লক্ষ

প্রশ্নমালা ১

১। অঙ্কে লিখঃ—

(১) তিনশত আট তার সুতা

(২) পাঁচশত একটি বাঁশ

(৩) ছয়শত বাষট্টিটি চরকা

(৪) সাতশত পঁয়তাল্লিশটি চারাগাছ

(৫) নয়শত আম

(৬) নয়শত উননব্বুইটি ধানের গুছি

(৭) নয়শত নিরানব্বুই জন বালক

(৮) সাতশত সাতষট্টিটি কলা গাছ

২। কথায় লিখঃ—

(১) ১২৩ তার সুতা

(২) ২০৩টি চরকা

(৩) ১১১টি গরু

(৪) ৩১৩টি আম

(৫) ৪৩৫টি লেবু

(৬) ৫০০ পাটি সুতা

মুখে মুখে উত্তর বলঃ—

৩। তোমার মা তোমাকে ৮টি, তোমার ভাইকে ৭টি এবং তোমার বোনকে ৬টি আম দিলেন। মোট তিনি তোমাদের কয়টি আম দিলেন?

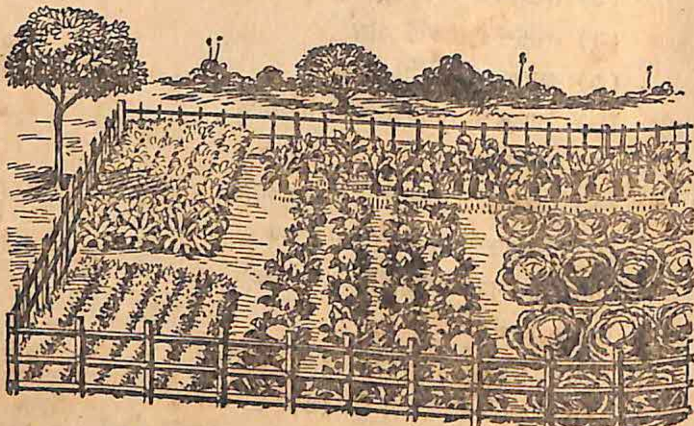
৪। একটি বাগানে ৩ সারি নারিকেল গাছ আছে। প্রথম সারিতে ৯টি, দ্বিতীয় সারিতে ১০টি এবং তৃতীয় সারিতে ১১টি গাছ আছে। বাগানে মোট কয়টি গাছ আছে?

৫। বৎসরে ৩৬৫ দিন; তাহার মধ্যে ৫২টি রবিবার; এ ছাড়া তোমাদের বিদ্যালয় ৮৫ দিন বন্ধ থাকে। তুমি বৎসরে কয়দিন বিদ্যালয়ে যাও?

৬। এক ব্যক্তির মাসিক আয় ৫০০৲ টাকা। তিনি প্রতি মাসে ৩৫০৲ টাকা খরচ করেন। মাসে তাঁহার কত টাকা করিয়া জমে?

৭। তোমাদের বাগানে এক এক সারিতে ১০টি করিয়া কলাগাছ পুঁতিলে ৮ সারিতে কতগুলি কলাগাছ থাকিবে?

৮। তোমাদের বিদ্যালয়ের বাগানটি ১২৫ হাত লম্বা ও ৭৫ হাত চওড়া। বাগানটি চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘিরিলে বেড়াটি কত লম্বা হইবে?



৯। একটি গর‍ুর ম‍ূল্য ৩৫৲ হইলে, ৪টি গর‍ুর ম‍ূল্য কত?

১০। ৬৩টি ফ‍ুল ৯ জন বালকের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকে কতগ‍ুলি করিয়া পাইবে?

১১। ৪৮টি মার্বেল ৬ জন বালকের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকে কয়টি করিয়া পাইবে?

১২। মাধব ঠিক ৮ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিল। ৪ বৎসর পরে মাধব বিদ্যালয় ছাড়িয়া ছিল, তারপর মাধব এই ২০ বৎসর ধরিয়া গ্রামে দোকান চালাইতেছে। মাধবের এখন বয়স কত?

প্রশ্নমালা ২

১। একজন কৃষকের ১০০৲ টাকা ছিল। সে তাহা হইতে ১২৲ টাকা খাজনা দিল, ৮৲ টাকার কাপড় কিনিল এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়া একই দামের ২টি বলদ কিনিল। এক একটি বলদের দাম কত?

২। একজন ধীবর ১২৫টি পোনামাছ বেচিতে বাহির হইল। সে এক পাড়ায় ৪৬টি এবং অপর এক পাড়ায় ৩৪টি মাছ বেচিয়া কয়েকটি এক ব্রাহ্মণকে বিনামূল্যে দিল। বাড়ী গিয়া দেখিল তাহার নিকট ৪০টি মাছ রহিয়াছে। সে কয়টি মাছ ব্রাহ্মণকে দিয়াছিল?

৩। এক দুগ্ধব্যবসায়ীর দুইটি পাত্র ছিল। এক পাত্রে ৯ সের ও অন্য পাত্রে ১৫ সের দুধ ছিল। সে একটি নূতন পাত্র কিনিল; তাহাতে ২০ সের দুধ ধরে। কয়েক সের দুধ বেচিয়া বাকী দুধ নূতন পাত্রে ঢালায় পাত্রটি পূর্ণ হইয়া গেল। সে কয় সের দুধ বেচিয়াছিল?

৪। কয়েকজন ছেলে মাঠে ফুটবল খেলিতে গেল। ১১ জন করিয়া দুইটি দল হইল এবং ৭টি ছেলে অন্য খেলা খেলিতে লাগিল। মোট কয়জন ছেলে ছিল?

৫। ১৬ জন মজুরের ৮ জনকে ৪৲ টাকা করিয়া, ৪ জনকে ২৲ টাকা করিয়া এবং বাকী ৪ জনকে ১৲ টাকা করিয়া দিতে মোট কত টাকা লাগিবে?

৬। একমণ চাউলের মূল্য ১৫৲ টাকা হইলে, ১২০৲ টাকায় কত মণ চাউল পাওয়া যাইবে?

৭। একজন মজুরের প্রথম দিনের আয় ৪৲ টাকা ৫ আনা, দ্বিতীয় দিনের আয় ৩৲ টাকা ৭ আনা এবং তৃতীয় দিনের আয় ২৲ টাকা ৪ আনা। তিনদিনে তাহার মোট উপার্জন কত?

৮। তুমি ১০৲ টাকা লইয়া বাজারে গিয়া ৩৲ টাকা ৪ আনার মাছ, ১৲ টাকা ২ আনা ৩ পয়সার আলু, ১০ আনা ২ পয়সার বেগুন, ৫ আনা ১ পয়সার শাক এবং ২ আনা ২ পয়সার তেঁতুল কিনিলে। এখন তোমার হাতে কত রহিল?

৯। একজন লোকের মাসিক আয় ৩০৲ টাকা ৮ আনা। বৎসরের শেষে খরচ বাদে তাঁহার হাতে ৬৬৲ টাকা থাকিল। তাঁহার মাসিক ব্যয় কত?

১০। একজন ব্যবসায়ী একমাস ৩২৫৲ টাকা ৮ আনার মাল বিক্রয়

করিল এবং ৩৫৲ টাকা দোকান ভাড়া দিল। তাহার ৫০৲ টাকা লাভ থাকিলে সে কত টাকা দিয়া ঐ মাল কিনিয়াছিল?

১১। এক দুগ্ধব্যবসায়ী ১০ আনা সের দরে ১৫ সের দুধ কিনিয়া তাহাতে ৫ সের জল মিশাইয়া ৯ আনা সের দরে বেচিল। ইহাতে তাহার কত লাভ বা ক্ষতি হইল?

১২। একজন ফলওয়ালা ১০৲ টাকা শত দরে ৫০০ আম কিনিল। তাহার মধ্যে ৮০টি আম পচিয়া যাওয়ায় ফেলিয়া দিতে হইল। বাকী আম টাকায় কয়টি করিয়া বেচিলে তাহার ১০৲ টাকা লাভ হইবে?

১৩। ৫ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে ৬১টি জামরুল এরূপ ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল যে ভাইয়েরা সকলে সমান পাইল, কিন্তু বোন একটি বেশী পাইল। বোন কয়টি পাইল?

১৪। ১ গজ কাপড়ের দাম ১৲ টাকা ২ আনা হইলে ৫ গজ ২ ফুট কাপড়ের দাম কত?

১৫। তোমার হাত ১৫ ইঞ্চি লম্বা। তোমার হাতের ২০ হাত লম্বা দড়ি কয় ফুট লম্বা হইবে?

১৬। একটি বাঁশের সিকি ভাগের দৈর্ঘ্য ৫ হাত। সমস্ত বাঁশটি কত লম্বা?

১৭। একটি দড়ির অর্ধেকটা পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল। ২০ হাত এখনো থাকিল। দড়িটি কত লম্বা ছিল?

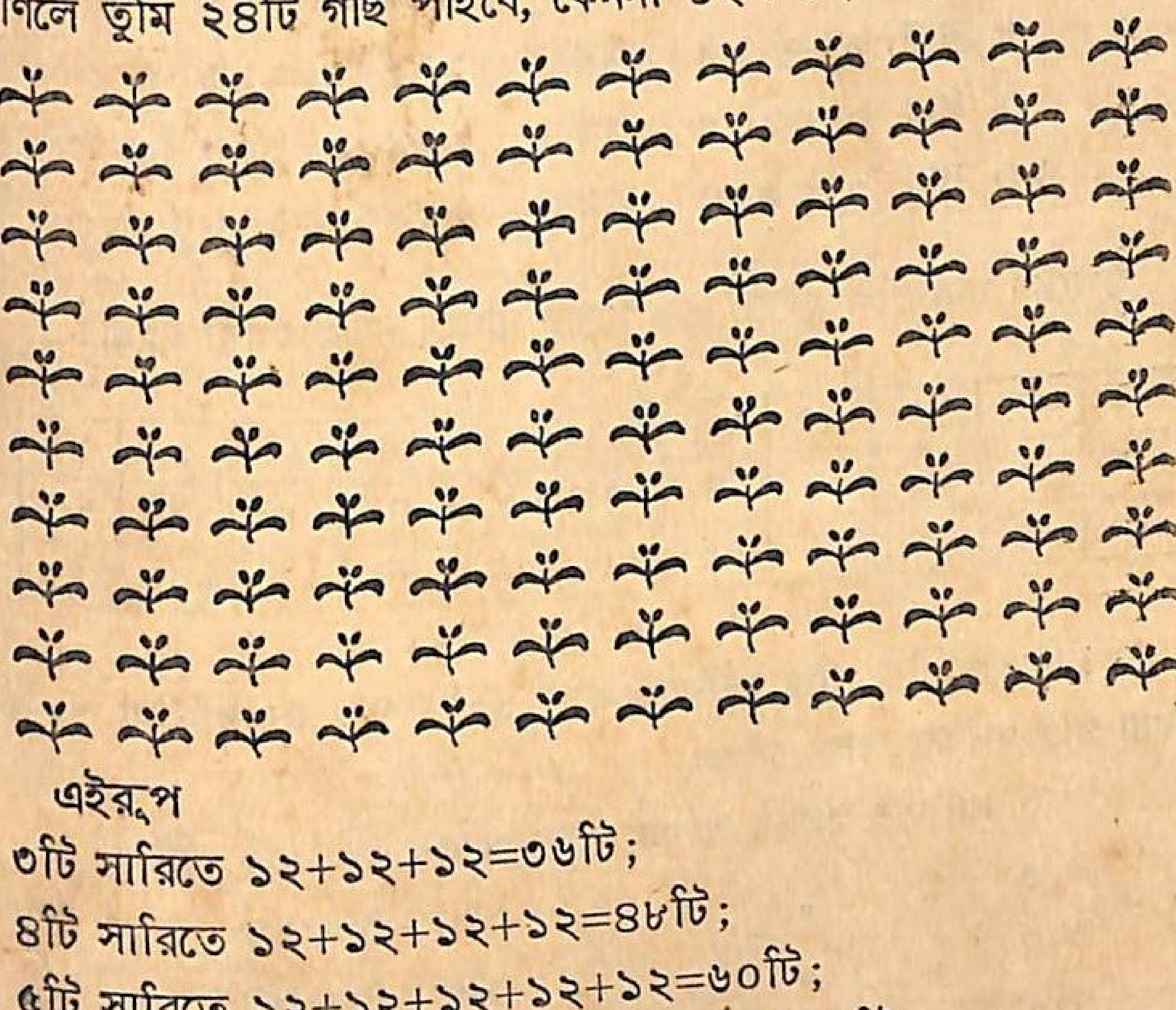
১৮। তোমাদের বিদ্যালয়ের কলাবাগানে ১ কাঁদি কলা হইয়াছিল। প্রতি কলা এক আনা দরে বেচিয়া ৫৲ টাকা পাওয়া গেল। কাঁদিতে কতগুলি কলা ছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

১২, ১৬ এবং ২০ ঘরের নামতা গঠন

(১) তোমাদের সবজী বাগানে ১০ সারি বেগুন গাছ আছে। প্রতি সারিতে ১২টি করিয়া গাছ আছে। প্রথম ২টি সারির গাছগুলি গুণিলে তুমি ২৪টি গাছ পাইবে, কেননা ১২+১২=২৪।



এইরূপ

৩টি সারিতে ১২+১২+১২=৩৬টি;
৪টি সারিতে ১২+১২+১২+১২=৪৮টি;
৫টি সারিতে ১২+১২+১২+১২+১২=৬০টি;
৬টি সারিতে ১২+১২+১২+১২+১২+১২=৭২টি;
৭টি সারিতে ১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২=৮৪টি;
৮টি সারিতে ১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২=৯৬টি;
৯টি সারিতে ১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২=১০৮টি;
১০টি সারিতে ১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২+১২= ১২০টি গাছ পাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে,

২ বার ১২= ২৪ অর্থাৎ ১২× ২= ২৪
৩ বার ১২= ৩৬ অর্থাৎ ১২× ৩= ৩৬
৪ বার ১২= ৪৮ অর্থাৎ ১২× ৪= ৪৮
৫ বার ১২= ৬০ অর্থাৎ ১২× ৫= ৬০
৬ বার ১২= ৭২ অর্থাৎ ১২× ৬= ৭২
৭ বার ১২= ৮৪ অর্থাৎ ১২× ৭= ৮৪
৮ বার ১২= ৯৬ অর্থাৎ ১২× ৮= ৯৬
৯ বার ১২=১০৮ অর্থাৎ ১২× ৯=১০৮
১০ বার ১২=১২০ অর্থাৎ ১২×১০=১২০

উপরের ফলগুলি হইতে ১২ ঘরের নামতা নীচে লেখা হইল।

১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০	১২	২৪	৩৬	৪৮	৬০	৭২	৮৪	৯৬	১০৮	১২০

(২) বাগানটির প্রতি সারিতে যদি ১২টি গাছ না থাকিয়া ১৬টি করিয়া গাছ থাকিত তাহা হইলে,

২ সারিতে গাছের সংখ্যা হইত ১৬× ২= ৩২ টি
৩ " " " " ১৬× ৩= ৪৮ "
৪ " " " " ১৬× ৪= ৬৪ "
৫ " " " " ১৬× ৫= ৮০ "
৬ " " " " ১৬× ৬= ৯৬ "
৭ " " " " ১৬× ৭=১১২ "
৮ " " " " ১৬× ৮=১২৮ "
৯ " " " " ১৬× ৯=১৪৪ "
এবং ১০ " " " " ১৬×১০=১৬০ "

উপরের ফলগুলি হইতে এখন নীচে ১৬ এর ঘরের নামতার ছক লেখা হইল—

১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০	১৬	৩২	৪৮	৬৪	৮০	৯৬	১১২	১২৮	১৪৪	১৬০

(৩) গাছের সংখ্যা প্রতি সারিতে ২০টি করিয়া হইলে পূর্বের মত গণনা করিয়া ২০ এর ঘরের নামতা পাওয়া যাইবে। উহা নীচের ছকে লেখা হইল।

২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০	২০	৪০	৬০	৮০	১০০	১২০	১৪০	১৬০	১৮০	২০০

উপরের নামতার সাহায্যে গুণনের উদাহরণ—

(১) ১৪×১২=কত ?

১৪×১২=১৪ বার ১২
=৪ বার ১২+১০ বার ১২
=৪×১২+১০×১২
=৪৮+১২০
=১৬৮

ইহা নিম্নলিখিত উপায়েও কষা হয়—

```
  ১২
  ১৪
 ----
  ৪৮   ... = ৪×১২
 ১২০   ... =১০×১২
 ----
 ১৬৮   ... =১৪×১২
```

অথবা সংক্ষেপে—

```
  ১২
  ১৪
 ----
  ৪৮
 ১২×
 ----
 ১৬৮
```

(২) ১৬×১৮=কত?

১৬×১৮=১৮ বার ১৬
=৮ বার ১৬+১০ বার ১৬
=৮×১৬+১০×১৬
=১২৮+১৬০
=২৮৮

কষিবার অন্য পদ্ধতিঃ—

```
 ১৬
 ১৮
-----
১২৮  ... = ৮×১৬
১৬০  ... =১০×১৬
-----
২৮৮  ... =১৮×১৬
```

সংক্ষেপে নিম্নের মত লেখা হয়—

```
 ১৬
 ১৮
-----
১২৮
১৬×
-----
২৮৮
```

(৩) ২০×১৯=কত?

২০×১৯=১৯ বার ২০
=৯ বার ২০+১০ বার ২০
=৯×২০+১০×২০
=১৮০+২০০
=৩৮০

অন্য পদ্ধতিঃ—

```
 ২০
 ১৯
-----
১৮০  = ৯×২০
২০০  =১০×২০
-----
৩৮০  =১৯×২০
```

সংক্ষেপেঃ—

```
 ২০
 ১৯
-----
১৮০
২০×
-----
৩৮০
```

প্রশ্নমালা ৩

১। ১১ বৎসরে কয় মাস?

২। ১৭টি টাকা ভাঙগাইলে কয়টি আনি পাওয়া যাইবে?

৩। ১৩ কুড়ি পান কিনিলে কতগুলি পান পাওয়া যাইবে?

৪। তক্‌লি ৪ বার ঘুরিলে ১ ইঞ্চি সুতা পাক হয়। ২০ ইঞ্চি সুতা কাটিতে তক্‌লি কয়বার ঘুরিবে?

৫। গুণফল নির্ণয় কর:—

(১) ১২×১৫	(৪) ১২×১৩	(৭) ১৬×১৬
(২) ১২×১৯	(৫) ২০×১৪	(৮) ২০×১৫
(৩) ১৬×১৫	(৬) ২০×১৭	(৯) ২০×২০

২

সাধারণ ভাগ

তোমরা ভাগ কাহাকে বলে জান এবং ছোট ছোট ভাগের অঙ্ক কষিতেও পার। ভাগ প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার সংক্ষিপ্ত বিয়োগ। এখন তোমরা অপেক্ষাকৃত বড় বড় ভাগের অঙ্ক কষিতে শিখিবে। ভাগের অঙ্কের বিশেষ বিশেষ সংখ্যার বিশেষ বিশেষ নাম আছে। যাহাকে ভাগ করা যায় তাহাকে **ভাজ্য** বলে, যতভাগে ভাগ করা যায় তাহাকে **ভাজক** বলে, ভাগ করিয়া এক এক ভাগে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে **ভাগফল** বলে এবং যাহাকে ভাগ করা চলে না, বাকী থাকে তাহাকে **ভাগশেষ** বলে।

দেখা যাক, ১০৮টি পান লইয়া ১৫টি করিয়া তাড়া বাঁধিলে কয়টি

তাড়া হয়। এখন ১০৮টি হইতে দফায় দফায় ১৫টি করিয়া পান লওয়া যাক—



১০৮
১৫ ... ১ম দফায় ১ তাড়া
———
৯৩
১৫ ... ২য় " "
———
৭৮
১৫ ... ৩য় " "
———
৬৩
১৫ ... ৪র্থ " "
———
৪৮
১৫ ... ৫ম " "
———
৩৩
১৫ ... ৬ষ্ঠ " "
———
১৮
১৫ ... ৭ম " "
———
৩

দেখা গেল, ১০৮টি পান হইতে ১৫টি পানের ৭টি তাড়া হইল এবং ৩টি পান বাকী থাকিল। সুতরাং বুঝা গেল ১০৮কে ১৫ ভাগ করিলে ৭টি ভাগ হইবে এবং ৩ অবশিষ্ট থাকিবে। যথা—

```
       ৭
   ———————
১৫) ১০৮
    ১০৫
   ———————
      ৩
```

এখানে—

ভাজ্য=১০৮
ভাজক= ১৫
ভাগফল= ৭
ভাগশেষ= ৩

এখানে ৭ বার ১৫=১০৫ এবং ১০৮এর মধ্যে ১০৫ অপেক্ষা ৩টি একক বেশী আছে; এই ৩ ভাগশেষ।

ভাগের উদাহরণ (১)

(১) ৩৪৫৬কে ১৩ ভাগে ভাগ—

```
১৩)৩৪৫৬(২০০
   ২৬০০
   ----
১৩)৮৫৬(৬০
   ৭৮০
   ----
১৩)৭৬(৫
   ৬৫
   ----
   ১১
```

১৩ হাজারকে ১৩ ভাগ করিলে ভাগফল ১ হাজার হয়। সুতরাং ৩ হাজারকে ১৩ ভাগ করিলে ভাগফল হাজারের ঘরের সংখ্যা হইতে পারে না। ৩ হাজার ৪ শত অর্থাৎ ৩৪ শতকে ১৩ ভাগ করিলে ভাগফল হয় ২০০ এবং ৮৫৬ বাকী থাকে। ৮৫৬ এর মধ্যে ৮৫ দশ আছে। ৮৫ দশকে ১৩ ভাগ করিলে ভাগফল হয় ৬ দশ বা ৬০ এবং ৭৬ বাকী থাকে। ইহার মধ্যে ১৩ যায় ৫ বার এবং ১১ বাকী থাকে। সুতরাং ভাগফলে পাওয়া গেল ২০০+৬০+৫=২৬৫ এবং অবশিষ্ট রহিল ১১। নীচে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি দেখান হইল।

```
    ২৬৫ =ভাগফল
   -----
১৩)৩৪৫৬
   ২৬
   ----
    ৮৫
    ৭৮
   ----
     ৭৬
     ৬৫
   ----
     ১১ =ভাগশেষ
```

৩ এর মধ্যে ১৩ নাই; সুতরাং ৪ পর্যন্ত ধরিয়া ৩৪ পাওয়া গেল। ৩৪ এর মধ্যে ১৩ আছে ২ বার। এখন ৪ এর উপরে ভাগফলের ২ লেখা হইল। (৪ এবং ২ উভয়ই শতকের ঘরের সংখ্যা।)

২ বার ১৩=২৬ বসিল ৩৪ এর নীচে; বিয়োগ করিয়া পাওয়া গেল ৮। ৮ এর পরে ৫ নামিয়া ৮৫ হইল। ৮৫ এর মধ্যে ১৩ আছে ৬ বার। এখন ভাজ্যের ৫ এর উপরে

ভাগফলের ৬ লেখা হইল। (৫ এবং ৬ উভয়ই দশকের ঘরের সংখ্যা।) ৬ বার ১৩=৭৮ এখন ৮৫ এর নীচে লিখিয়া বিয়োগ করিয়া ৭ পাওয়া গেল। ৭ এর পাশে ভাজ্যের ৬ নামিয়া ৭৬ হইল। ৭৬ এর মধ্যে ১৩ আছে ৫ বার। সুতরাং ভাগফলে এককের ঘরে ৫ বসিল এবং ৫ বার ১৩=৬৫; ইহা ৭৬ এর নীচে লিখিয়া বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট ১১ পাওয়া গেল। সুতরাং পূর্বের মতই ভাগফল=২৬৫ এবং ভাগশেষ= ১১ হইল।

ভাগের উদাহরণ (২)

৭৪৫৬কে ৬৭ ভাগে ভাগ—

```
      ১১১  ... =ভাগফল
   ───────
৬৭) ৭৪৫৬
    ৬৭
   ───────
     ৭৫
     ৬৭
   ───────
      ৮৬
      ৬৭
   ───────
      ১৯  ... =ভাগশেষ
```

উদাহরণ (৩)

১৭৯২কে ৪২ ভাগে ভাগ—

```
       ৪২  ... =ভাগফল
   ────────
৪২) ১৭৯২
    ১৬৮
   ────────
     ১১২
      ৮৪
   ────────
      ২৮  ... =ভাগশেষ
```

উদাহরণ (৪)

৫৫৫৫৫কে ৫৫ ভাগে ভাগ—

```
   ১০১ ... = ভাগফল
  ------
৫৫)৫৫৫৫৫
   ৫৫
  ------
     ৫৫
     ৫৫
  ------
      ×
```

এখানে ৫৫ শতে ৫৫ একশত বার আছে। সুতরাং ভাগফলে শতকের ঘরে ১ বসিল। ৫ দশকের মধ্যে ৫৫ একবারও নাই; সেজন্য ভাগফলে দশকের ঘরে ০ বসিল। ৫৫ একবার আছে; সুতরাং ভাগফলে এককের ঘরে ১ বসিল। অতএব ভাগফল ১০১। কোন ভাগশেষ নাই।

প্রশ্নমালা ৪

১। তোমাদের ১২ জনের মধ্যে ২০০টি লিচু সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকে কয়টি করিয়া পাইবে এবং কয়টি লিচু অবশিষ্ট থাকিবে?

২। ১ কাঠা জমিতে ৪ মণ আলু জন্মিলে, ২২৪ মণ আলুর জন্য কয় কাঠা জমির প্রয়োজন?

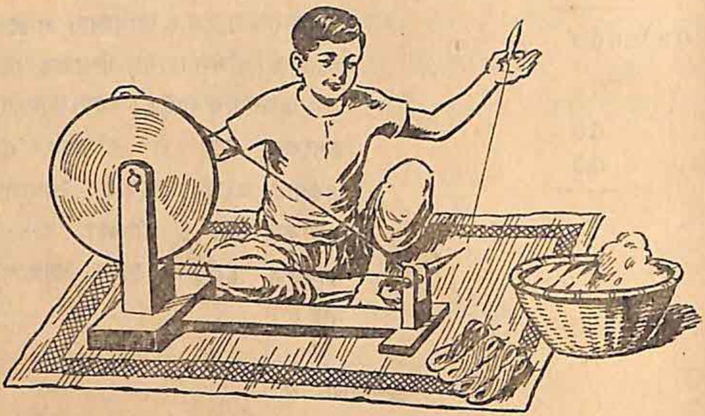
৩। একখানি গরুর গাড়ীতে ১৮ মণ চাউল যাইতে পারে। ৩৭৮ মণ চাউল বহন করিতে কয়খানি গরুর গাড়ীর দরকার?

৪। এক কৃষক টাকায় ১৭টি করিয়া শসা বেচিতেছিল। তাহার নিকট ২৭২টি শসা থাকিলে সে শসা বেচিয়া কত পাইবে?

৫। তোমাদের প্রত্যেককে সুতা কাটিবার জন্য ৪ তোলা করিয়া কার্পাস তুলা দেওয়া হইল। ইহাতে মোট ১১৬ তোলা তুলা লাগিল। তোমরা কয়জন আছ?

৬। এক কৃষকের ক্ষেতে ২ হাত অন্তর কচু লাগাইবার জন্য আইল প্রস্তুত করা হইল। ৮০ হাত লম্বা জমিতে এরূপ কতটি আইল হইবে?

৭। তুমি এক সপ্তাহে ৪২০ তার সূতা কাটিয়াছ। যদি দৈনিক একই পরিমাণ সূতা কাটিয়া থাক, তবে প্রতিদিন তুমি কত তার সূতা কাটিয়াছ?



৮। একটি খেয়াঘাটে ২৬২ জন লোক পার হইবার জন্য উপস্থিত হইল। নৌকায় দাঁড়ি ও মাঝি ছাড়া আর ২০ জন লোক যাইতে পারে। বল দেখি, সব লোক পার করিতে নৌকাখানিকে কতবার পারাপার করিতে হইবে?

৯। ১৯২কে ১২ ভাগে ভাগ কর
১০। ২৭৫কে ২৫ " " "
১১। ৪০০কে ২৫ " " "
১২। ৫০০কে ২০ " " "
১৩। ৬৭২কে ৩২ " " "
১৪। ৭৭০কে ৩৫ " " "
১৫। ৮০৪কে ৪২ " " "
১৬। ৯৮৭কে ৪৭ " " "
১৭। ৯৯৬কে ৬২ " " "
১৮। ১০২৪কে ১২ " " "

১৯। ৪০৩২কে ২০ ভাগে ভাগ কর
২০। ৫৬৮৪কে ২৪ „ „ „
২১। ৬০৮০কে ৫০ „ „ „
২২। ৬৪৬৪কে ৬৪ „ „ „
২৩। ৭২৭৬কে ৭২ „ „ „
২৪। ৬০০০কে ৮০ „ „ „
২৫। ৭৫৬০কে ৯০ „ „ „

তৃতীয় অধ্যায়

রৈখিক পরিমাপ—মাইল এবং ক্রোশ

তোমাদের গ্রাম হইতে তোমাদের রেল স্টেশন কত দূর জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা কেহ ক্রোশে, কেহ বা মাইলে উত্তর করিবে। বড়দের মুখে শুনিয়া তোমরা একথা বলিতেছ। প্রকৃতপক্ষে ক্রোশ বা মাইল কতখানি তাহা তোমরা ঠিকভাবে বোঝ না। তোমরা ফুট-রুল দেখিয়াছ। উহার সহিত তোমরা পরিচিত। ইহার দৈর্ঘ্যকে ফুট বলে। ইহার ১২ ভাগের ১ ভাগকে ইঞ্চি বলা হয়। এক রকম গজকাঠিও তোমরা দেখিয়াছ। তাহার দৈর্ঘ্য ৩ ফুটের সমান। তোমরা জান, এই গজ, ফুট, ইঞ্চি, মাইল প্রভৃতি মাপগুলি ইংরাজী। ইংরাজ শাসনের আমলে এগুলি আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে একটি সরকারী অফিসে একটি পিতলের ডাণ্ডা আছে। উহারই দৈর্ঘ্যকে আসল ১ গজ ধরা হয়। এইটি আমাদের দেশেও সরকার-অনুমোদিত গজের মাপ। এই গজকাঠি দিয়া কাপড়ের দোকানে কাপড় মাপা হয়। আচ্ছা, তোমাকে যদি তোমাদের গ্রাম হইতে রেল স্টেশনের দূরত্ব মাপিতে বলা হয়, তুমি কি এই গজ-কাঠি বা ফুট-রুল দিয়া মাপিবে? না, তাহার দরকার হয় না। দূরত্ব বেশী হইলে তাহার মাপকাঠিও বড় হয়।

তোমার কিশলয়খানি কতখানি লম্বা বলিলে তুমি ইঞ্চি দিয়া মাপিবে। তোমাদের বিদ্যালয় বাড়িটি কতখানি লম্বা বলিলে তুমি ফুট-রুল বা গজ-কাঠি দিয়া মাপিবে। কিন্তু স্টেশনের দূরত্বের বেলা এই সব ছোট মাপকাঠি ব্যবহার করা বড়ই কষ্টকর ও অসুবিধাজনক। এসব স্থলে আমরা আরও অনেক বেশী দীর্ঘ মাপকাঠি ব্যবহার করিয়া থাকি। সেগুলিরই কথা এখন তোমরা শুনিবে।

তোমরা হয়ত আমিন বাবুদের জরিপ করিতে দেখিয়াছ। তাঁহারা এক রকম শিকল ফেলিয়া ফেলিয়া মাপিয়া থাকেন। এই শিকল ঠিক ২২ গজ লম্বা হয়। শিকলকে ইংরাজীতে চেইন বলে। বেশী দূর মাপিতে এই চেইনের ব্যবহার হয়। এই চেইন ৮০ বার পরপর মাপিলে যতটা দূরত্ব হয়, তাহাকে মাইল বলে। মাইলও ইংরাজী কথা। এই দুই মাইল দূরত্বকে ক্রোশ বলা হয়। নীচের তালিকাটি হইতে তোমরা ইহাদের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে।

১২ ইঞ্চি = ১ ফুট	২২ গজ = ১ চেইন
৩ ফুট = ১ গজ	৮০ চেইন = ১ মাইল

২ মাইল = ১ ক্রোশ



∴ ১ মাইল = ২২×৮০ = ১৭৬০ গজ।
এবং ১ ক্রোশ = ১৭৬০×২ = ৩৫২০ গজ।

কোন বড় রাস্তা ধরিয়া গেলে তোমরা মাঝে মাঝে একটি করিয়া পাথরের ফলক দেখিতে পাইবে। তাহাতে একটি করিয়া ইংরাজী সংখ্যা খোদাই করা থাকে। এইগুলি মাইলের অঙ্ক। এক মাইল অন্তর অন্তর এইরূপ এক একটি ফলক থাকে। তোমরা শুনিয়া থাকিবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মেদিনীপুর হইতে কলিকাতা আসিবার পথে এই মাইলের অঙ্ক দেখিয়াই ১ হইতে ৯ পর্যন্ত ইংরাজী অঙ্কগুলি শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। জেলা শাসকের কাছারি হইতে এই মাপ আরম্ভ হয় এবং মাইল ফলকগুলি সহর হইতে দূরত্ব দেখাইয়া থাকে।

কাজ—

তোমরা সকলে কার্ডবোর্ড দিয়া নিজেদের জন্য একখানা করিয়া ফুট-রুল তৈরি কর। দড়ি দিয়া বা কাপড়ের ফিতা দিয়া গজ, ও দড়ি দিয়া ২২ গজের একটি চেইন তৈরি কর। তারপর চেইনটি লইয়া রাস্তায় গিয়া মাপিতে মাপিতে যাও দেখ কতদূর যাইতে পার।

প্রশ্নমালা ৫

১। তোমাদের বাড়ি হইতে বিদ্যালয় ৮৮০ গজ। তুমি প্রতিদিন বিদ্যালয় যাতায়াতে কত পথ হাঁট?

২। তোমাদের খেলার মাঠটি ৭০ গজ লম্বা ও ৩০ গজ চওড়া। মাঠটির চারিদিকের আইল ধরিয়া ৪ বার ঘুরিলে তোমার কত পথ হাঁটা হইবে?

৩। একখানি ক্ষেত ৩৩ গজ লম্বা। তাহাতে লাঙ্গল দিতে ১০ বার এদিক ওদিক করিলে কৃষকের কত পথ হাঁটা হইবে?

৪। গ্রামের পুকুরে দুইটি ঘাটের ব্যবধান ২২ গজ। এ ঘাট ও ঘাট করিয়া কতবার সাঁতার কাটিলে তোমার ৪৪০ গজ সাঁতরান হইবে?

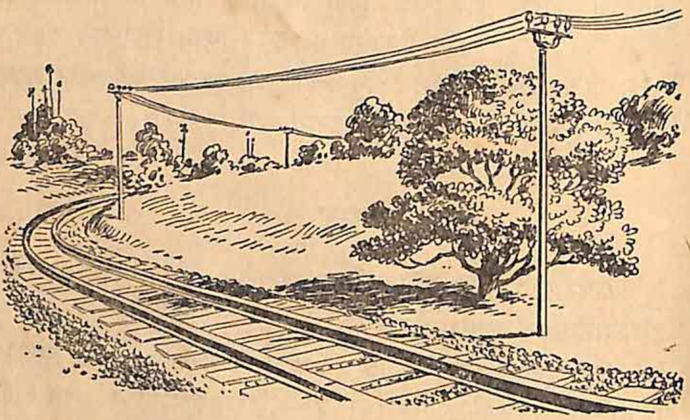
৫। একখানি ট্রেন ৫ সেকেণ্ডে ১১০ গজ যায়। ১ মাইল যাইতে ট্রেনটির কতক্ষণ লাগিবে?

৬। একটি চাকার বেড় ৮ ফুট। ৪৪০ গজ যাইতে চাকাটি কয়পাক ঘুরিবে?

৭। একটি নাটাই-এর বেড় ৪ ফুট। তুমি নাটাইয়ে ৩০০ পাক সূতা জড়াইয়াছ। কত গজ সূতা জড়ান হইয়াছে?

৮। একটি বালক একবার পা ফেলিয়া ১৬ ইঞ্চি যায়। সে ১৫০ বার পা ফেলিয়া কতদূর যাইবে?

৯। একখানি ক্ষেত ১০০ ফুট লম্বা ও ১০০ ফুট চওড়া। ইহার চারিদিকে ১০ ফুট অন্তর খুঁটি পুঁতিয়া বেড়া বাঁধাইতে কতগুলি খুঁটি লাগিবে?



১০। রেল পথের ধারে ৮০ গজ অন্তর টেলিগ্রাফের খুঁটি পোতা আছে। একটি স্টেশন হইতে পরবর্তী স্টেশন ২ ক্রোশ দূর হইলে, তাহাদের মধ্যে কয়টি খুঁটি আছে?

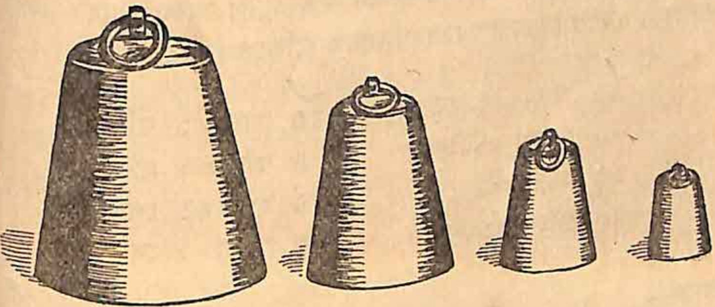
চতুর্থ অধ্যায়

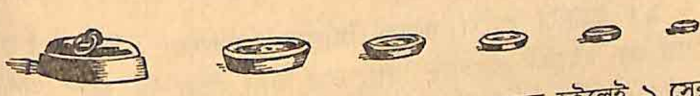
ওজন

আনা, তোলা, কাঁচ্চা, ছটাক, পোয়া, সের, মণ

লিখন প্রণালী

ওজন বলিতে কি বুঝায় তাহা তোমরা কতকটা জান। বাজারে গিয়া ১ সের চাল কিনিতে চাহিলে দোকানদার একটি দাঁড়িপাল্লার একদিকে একটি চ্যাপ্টা গোল লোহা চাপায়, অন্যদিকে চাল চাপায়। যখন দাঁড়িটা ঠিক সমান হয়, তখন তোমাকে চাল দেয়। এই চালের ওজন ১ সের। ইহা যে ঠিক ওজন তাহা কিরূপে জানা যায়? ঐ লোহা-টির ওজন ধরা হয় ১ সের ও উহার পিঠে ১ সেরের দাগ ছাপা থাকে।





ইহা সরকারের অনুমোদিত বলিয়া ইহার ওজনের সমান হইলেই ১ সের ওজন ঠিক হইয়াছে ধরিয়া লওয়া হয়। যে কোন লোহায় যে কেহ ১ সেরের দাগ ছাপিলেই তাহা ঠিক ১ সের বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় না।

ছোট আর একটি ওজনের কথা তোমরা শুনিয়াছ। ক্ষেতে চাষ করিবার পূর্বে শস্যের বীজ কিনিতে হয়, তাহা তোমরা জান। এই বীজ তোলায় ওজন করা হয়। এক একজন কৃষক প্রতি বৎসর প্রায় ২ তোলা কপির বীজ, ৫ তোলা মূলার বীজ প্রভৃতি সরকারী কৃষি সমিতি হইতে বিনামূল্যেও পাইয়া থাকে। এই তোলার ওজন একটি রূপার টাকার ওজনের সমান। সোনা-রূপা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য এই তোলায় ওজন হইয়া থাকে। পূর্বে যে সেরের কথা বলা হইয়াছে তাহার ওজন সাধারণতঃ ৮০টি রূপার টাকার ওজনের সমান। সেরের ওজন কিন্তু সর্বত্র একরূপ নহে। কোন স্থানে কম, কোন স্থানে বেশী। এখন যাহাতে সর্বত্র সের একরূপ অর্থাৎ ৮০টি রূপার টাকার ওজনের সমান বা ৮০ তোলার সমান হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

তোমরা জান ১৬ আনায় ১ টাকা। ওজনের বেলাও ঠিক তেমনই ১৬ আনায় ১ তোলা, অর্থাৎ ১ তোলার ১৬ ভাগের এক ভাগ ওজনকে ১ আনা বলা হয়। ওজনের আরও কতকগুলি সংজ্ঞা আছে। নীচের তালিকা হইতে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে।

১৬ আনা =১ তোলা	২০ আনা =১ কাঁচ্চা
৫ তোলা =১ ছটাক	৪ কাঁচ্চা =১ ছটাক
১৬ ছটাক =১ সের	৪ ছটাক =১ পোয়া
৪০ সের =১ মণ	৪ পোয়া =১ সের

কাজ—

১। তোমরা স্কুলে সকলে মিলিয়া বনভোজন করিবে। খিচুড়ি রান্না করা হইবে। প্রত্যেকে কিছু চাল, ডাল, তেল, ঘি, লবণ, অন্যান্য মসলা ও ভাজার জন্য কিছু তরিতরকারি লইয়া আসিবে।

একটি দাঁড়িপাল্লা আগে তৈরি করিয়া বা যোগাড় করিয়া রাখিবে। গোল টিনের ঢাকনা বা কার্ডবোর্ড দিয়া দাঁড়িপাল্লা তৈরি করিতে

পারিবে। ওজনগুলি শিক্ষকমহাশয় তোমাদের জন্য যোগাড় করিয়া আনিবেন।

প্রত্যেকে কে কতটুকু জিনিস আনিলে দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে ওজন করিয়া লিখিয়া একটি হিসাব তৈরি কর। প্রথমে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া মাপিয়া দেখ, ও পরে সব একত্র মাপ।

২। প্রতিদিন সুতা কাটার সময় যে তুলা পাইবে তাহা কাটিবার আগে ওজন করিয়া হিসাব লিখিয়া রাখ। আগে যতখানি তুলা ক্লাশে আসিল সেইটুকু মোট ওজন কর। তারপর প্রত্যেককে কিছু কিছু ভাগ করিয়া দাও ও কে কত নিল ওজন করিয়া দেখ ও লিখিয়া রাখ। সুতা কাটার ঘণ্টা শেষ হইলে ছেঁড়া সুতা সব একত্র করিয়া আবার মাপিয়া দেখ কতখানি নষ্ট হইল ও আবার তাহার হিসাব লেখ।

৩। তোমাদের সব্জি বাগান হইতে কোনও সব্জি তোলা হইলে তাহা মাপিয়া দেখ।

এই হিসাব লিখিতে হইলে প্রত্যেকবার কাঁচ্চা, ছটাক, পোয়া ইত্যাদি বড় শব্দগুলি না লিখিয়া কয়েকটি সঙ্কেত বা চিহ্ন দ্বারা সহজে ও অল্প জায়গার ভিতর অল্প সময়ে লিখিতে পার। সেই সঙ্কেতগুলি নীচে দেওয়া হইল।

১ আনা = /০	৯ আনা = ॥/০
২ আনা = ৵০	১০ আনা = ॥৵০
৩ আনা = ৶০	১১ আনা = ॥৶০
৪ আনা = ।০	১২ আনা = ৸০
৫ আনা = ।/০	১৩ আনা = ৸/০
৬ আনা = ।৵০	১৪ আনা = ৸৵০
৭ আনা = ।৶০	১৫ আনা = ৸৶০
৮ আনা = ॥০	১৬ আনা = ১৲ তোলা

১ ছটাক = //০
২ ছটাক = /৵০
৩ ছটাক = /৶০
৪ ছটাক = /।০ (পোয়া)
৮ ছটাক = /॥০ (আধসের)
১২ ছটাক = /৸০ (তিনপোয়া)
১৬ ছটাক = /১ (সের)

১০ সের = ।০ (সিকি মণ)
১১ সের = ।১
১২ সের = ।২
১৫ সের = ।৫
১৯ সের = ।৯
২০ সের = ॥০ (আধ মণ)
৩০ সের = ৸০
৪০ সের = ১/০ (মণ)

১ কাঁচ্চা=৲৫
২ কাঁচ্চা=৲১০
৩ কাঁচ্চা=৲১৫
৪ কাঁচ্চা=//০ (ছটাক)

লক্ষ্য করিবে—
৫ তোলা= ৪ কাঁচ্চা=১ ছটাক (//০)
৮০ তোলা=৬৪ কাঁচ্চা=১ সের (/১)

এখানে তোমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিবে। আমরা যে কোন জিনিসের সিকি বুঝাইতে ।০ আঁকটি ব্যবহার করি। ইহাকে চোক বলে। এক মণের সিকি দশ সের বুঝাইতে আমরা লিখি ।০, এক টাকার সিকি চার আনা বুঝাইতে লিখি ।০, এক সেরের সিকি এক পোয়া বুঝাইতেও এই ।০ লিখি, ১ গণ্ডার সিকি এক কড়াও ।০ দিয়া লিখি, ১ বিঘার সিকি পাঁচ কাঠাও ।০ দিয়া বুঝাই।

আবার সিকির সিকি বুঝাইতে /০, এই আঁকটি ব্যবহার করিয়া থাকি; ইহাকে এক আনার বা ১ পণের চিহ্ন বলে। এইরূপে দুইটি /০ বুঝাইতে ৵০, ৩টি বুঝাইতে ৶০ লিখিয়া থাকি। সুতরাং এখন বুঝিতে পারিতেছ, নয় আনা লিখিতে দুইটি সিকি ও একটি আনা লিখিতে হইবে, অর্থাৎ ॥/০ এইটি নয় আনার চিহ্ন। আবার এইটিই নয় ছটাক লিখিতেও ব্যবহৃত হয়। এইরূপে ।৶০=সাত আনা বা সাত ছটাক; ৸৵০=চৌদ্দ আনা বা চৌদ্দ ছটাক। পরে যে আনা, ছটাক প্রভৃতি লেখা হইয়াছে, তাহা এই চোক পণের সাহায্যে লেখা হইয়াছে।

এক সঙ্গে মণ সের ছটাক প্রভৃতি কিরূপে লেখা হয় দেখান হইতেছে—

(১) ৩ মণ ৫ সের ৭ ছটাক ২ তোলা = ৩/৫।৶২ তোলা
(২) ৭ মণ ১২ সের ৮ ছটাক ১ তোলা = ৭।২॥১ তোলা
(৩) ১০ মণ ৩০ সের ৩ তোলা =১০৸৻৩ তোলা
(৪) ১২ মণ ২৫ সের ২ তোলা =১২॥৫৻২ তোলা
(৫) ৯ মণ ১৩ সের ৬ ছটাক ২ কাঁচ্চা = ৯।৩।৵১০ কাঁচ্চা
(৬) ২১ সের ১৩ ছটাক ৩ কাঁচ্চা = ॥১৸/১৫ কাঁচ্চা
(৭) ১৩ মণ ৫ ছটাক ২ কাঁচ্চা =১৩/।/১০ কাঁচ্চা
(৮) ১৫ সের ৩ কাঁচ্চা = ।৫৻১৫ কাঁচ্চা
(৯) ২২ মণ ২ কাঁচ্চা =২২/০৻১০ কাঁচ্চা
(১০) ৩২ মণ ২ তোলা =৩২/০৻২ তোলা
(১১) ৩ ছটাক ২ তোলা ৫ আনা = /৶২।/৭ আনা
(১২) ৭ ছটাক ২ আনা = /।৶০/৵০ আনা

প্রশ্নমালা ৬

১। (ক) তোমাদের বিদ্যালয়ের সব্‌জি বাগানের জন্য ৩ ছটাক ২ তোলা বাঁধাকপির বীজ সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠান হইতে পাইলে। কত বীজ তোমরা পাইলে অঙ্কে লিখিয়া প্রকাশ কর।

(খ) তোমাদের জমিতে এ বৎসর সাত মণ ছাব্বিশ সের আলু হইয়াছে। এই আলুর পরিমাণ অঙ্কে প্রকাশ কর।

(গ) বিদ্যালয়ের সব্‌জি বাগানে ৩ সের ৯ ছটাক টমেটো, ১২ সের ১৪ ছটাক কড়াই শুঁটি ও ২২ সের ৩ পোয়া বেগুন হইয়াছে। কোন্ সব্‌জি কত ফলিয়াছে, অঙ্কে প্রকাশ কর।

(ঘ) সুতা কাটিবার জন্য যদু ২ ছটাক ৩ তোলা, রাম ৩ ছটাক, মধু ১ ছটাক ৪ তোলা তুলা লইল। কে কত তুলা লইল, অঙ্কে প্রকাশ কর।

২। (ক) তুমি /৵৩ তোলা এবং হরি /৷/২ তোলা তূলা লইয়াছ। কথায় লিখ, তোমরা কে কত তূলা লইয়াছ।

(খ) একটি কুমড়ার ওজন /৫।৵০ ছটাক ও আর একটির ওজন /৬/০ ছটাক। কোন্ কুমড়াটির কত ওজন, কথায় লিখ।

(গ) একজন কৃষকের গত বৎসর মোট মণ ৭৮৷৷৮ সের ধান, মণ ৭।২ সের আলু ও মণ ৩৸১ সের কলাই হইয়াছিল। তাহার কোন্ ফসল কত ফলিয়াছিল, কথায় লিখ।

(ঘ) এক গৃহস্থ মুদীর দোকান হইতে /১।০ পোয়া লবণ, /৷৷৵০ লঙ্কা ও /৩।৵০ ছটাক সরিষার তেল কিনিলেন। তিনি কোন্ জিনিস কত কিনিলেন, কথায় লিখ।



৩। কথায় লিখঃ—

(১) ৭/৭।৶০
(২) ১০।০৷৷৵০
(৩) ১২।৭৲১৫
(৪) ২১৸৩৷৷৶১০
(৫) ২৭৷৷৫৷৷৵০
(৬) ।৬।৪
(৭) ৷৷৩
(৮) /৬।৶০
(৯) ৸৯৸৶১৫
(১০) /৶১০

৪। অঙ্কে প্রকাশ করঃ—

(১) ৭ম ২৬ সে
(২) ৯ম ৩৭ সে
(৩) ১০ম ১২ সে
(৪) ১৩ম ৭ সে ২ ছ
(৫) ১৬ম ১৯ সে ৭ ছ
(৬) ১০ম ৬ ছ
(৭) ১৫ম ১২ ছ
(৮) ২২ম ১০ সে ৪ ছ
(৯) ৩ম ৫ সে ৯ ছ ২ তোলা
(১০) ১১ম ১০ সের ১০ ছ ২ কাঁ

পঞ্চম অধ্যায়

কড়া, গণ্ডা, বুড়ি চিহ্নের ব্যবহার

পূর্বকালে আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দাম খুব সস্তা থাকায় খুব অল্প মূল্যের জিনিসেই লোকের কাজ চলিয়া যাইত। ধান, চাউল, মশলা-পাতি, তরিতরকারি লোকে কড়ি দিয়া কেনা বেচা করিত। এখন জিনিসপত্রের দাম খুব চড়িয়া যাওয়ায় কড়ি ত দূরের কথা, পয়সা দিয়াও পূর্বকালের ১ কড়ি দামের জিনিস পাওয়া যায় না। এই কড়ির মূল্য যে কত কম ছিল, তোমরা ধারণাই করিতে পার না। ৪টি কড়ির মূল্যকে ১ গণ্ডা বলা হইত এবং ২০টি কড়ি বা ৫ গণ্ডায় ১ পয়সা হইত।

আজকাল তোমরা দেখিয়াছ, বাজারে ৬ পয়সায় ১ গণ্ডা জামরুল পাওয়া যায়। এই গণ্ডাতে মাত্র ৪টি বুঝায়। পূর্বে ৪ কড়িতে যেমন ১ গণ্ডা ছিল, এখন তেমনি ৪ কড়াতে অর্থাৎ ৪ টাতে ১ গণ্ডা হইতেছে। সংখ্যার দিক দিয়া ২০টি দ্রব্যকে ৫ গণ্ডা বা ১ কুড়ি দ্রব্য বলা হয়। যাহা ১ কুড়ি, মূল্যের দিক দিয়া তাহাই ১ পয়সা এবং উভয়কে একই চিহ্ন দ্বারা লেখা হয়।

নীচের তালিকা হইতে তোমরা ইহাদের সম্পর্ক বুঝিতে পারিবেঃ—

৪ কড়া = ১ গণ্ডা (৴১)		
৫ গণ্ডা = ১ বুড়ি (৴৫)		জিনিস গণনায় ব্যবহৃত হয়।
৪ বুড়ি = ১ পণ (/০)		
১৬ পণ = ১ কাহন (১/০)		
৪ কড়া = ১ গণ্ডা (৴১)		
৫ গণ্ডা = ১ পয়সা (৴৫)		মূল্য বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।
৪ পয়সা = ১ আনা (/০)		
১৬ আনা = ১ টাকা (১৲)		

আমাদের দেশে ব্যবহৃত মুদ্রাগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

২ পয়সা = ১ আধআনি (৴১০)	৪ আনা = ১ সিকি (।০)
৪ পয়সা = ১ আনি (/০)	৮ আনা = ১ আধুলি (॥০)
২ আনা = ১ দুয়ানি (৵০)	১৬ আনা = ১ টাকা (১৲)



মূল্য বুঝাইতে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলির ব্যবহার করা হয়—

১ কড়া = ৻।
২ কড়া = ৻॥
৩ কড়া = ৻৸
৪ কড়া = ১ গণ্ডা = ৻১
৫ গণ্ডা = ১ পয়সা = ৻৫
২ পয়সা = ৻১০
৩ পয়সা = ৻১৫
৪ পয়সা = ১ আনা = ⁄০

২ আনা = ৵০
৩ আনা = ৶০
৪ আনা = ।০
৫ আনা = ।⁄০
৬ আনা = ।৵০
৭ আনা = ।৶০
৮ আনা = ॥০
১২ আনা = ৸০
১৬ আনা = ১৲

আধপয়সা = ৻২॥
দেড় পয়সা = ৻৭॥
আড়াই পয়সা = ৻১২॥
সাড়ে তিন পয়সা= ৻১৭॥

একসঙ্গে টাকা আনা পাই প্রভৃতি কিরূপে লেখা হয়, দেখান হইতেছে—

(১) ৭ টাকা ১০ আনা = ৭॥৵০
(২) ৯ টাকা ৮ আনা = ৯॥০
(৩) ১২ টাকা ১৪ আনা ২ পয়সা = ১২৸৵১০
(৪) ১৮ টাকা ৬ আনা আধ পয়সা = ১৮।৵২॥
(৫) ২৩ টাকা ১১ আনা সাড়ে তিন পয়সা = ২৩॥৶১৭॥
(৬) ৩৪ টাকা ২ আনা ১ পয়সা = ৩৪৵৫
(৭) ১০ টাকা ১০ আনা ১২ গণ্ডা ২ কড়া = ১০॥৵১২॥
(৮) ৪২ টাকা ১৭ গণ্ডা ২ কড়া = ৪২৲৻১৭॥
(৯) ৫৪ টাকা ৮ আনা ২ গণ্ডা ২ কড়া = ৫৪॥২॥
(১০) ৭২ টাকা ৬ আনা দেড় পয়সা = ৭২।৵৭॥

কাজ—

১। তোমাদের স্কুলের জন্য খাতা, পেন্সিল, রবার, রং, তুলা, ঝাড়ন, চক বা খড়িমাটি, সূঁচ, সুতা, কাঁচি, পশম প্রভৃতি যা কিছু লাগে এই সব দিয়া একটি দোকান খুলিবে। এই দোকানের সমস্ত হিসাব তোমাদের লিখিতে হইবে ও রাখিতে হইবে। একখানি খাতায় সমস্ত জিনিসের কোন্‌টির কত দাম লিখিবার জন্য সঙ্কেতগুলি শিখিয়া লও।

২। তোমাদের লাইব্রেরীতে যত বই আছে তার একটি তালিকা তোমরা আগে নিশ্চয়ই করিয়াছ। এখন নামের পাশে পাশে কোন্‌ বইটির কত দাম তাহাও লিখিয়া রাখ। কোনও বই হারাইলে তখনই বুঝিতে পারিবে কত দামের বই হারাইয়াছে।

৩। সরস্বতী পূজা, বনভোজন বা কোনও উৎসবের জন্য যদি চাঁদা তোল তবে তার হিসাব লিখিয়া রাখ। উৎসবের জন্য খরচের হিসাবও লিখিয়া রাখ। এই হিসাব লিখিবার জন্য টাকা আনা পয়সার সঙ্কেত তো লিখিতে শিখিবেই, তা ছাড়া আধ পয়সা, দেড় পয়সা, আড়াই পয়সা, সাড়ে তিন পয়সা প্রভৃতি কেমন করিয়া লিখিতে হয় ভাল করিয়া শিখিয়া রাখ।

প্রশ্নমালা ৭

১। (ক) এক মণ তুলার দাম ৮০৵০। তুলার দাম কত কথায় লিখ।

(খ) এক মণ চালের দাম ১৬৷৵১০। চালের দাম কথায় প্রকাশ কর।

(গ) এক সের বেগুনের দাম ।৵১২॥। বেগুনের দাম কথায় লিখ।

(ঘ) বনভোজনের জন্য চাঁদা আদায় হইল ৭॥৵১৫; কত চাঁদা আদায় হইল, কথায় প্রকাশ কর।

(ঙ) একজন মজুরের দৈনিক খরচ বাদে এক টাকা দুই আনা তিন পয়সা জমে। তাহার দৈনিক কত জমে, অঙ্কে লিখ।

(চ) একজন মুদী হাটবারে বিক্রয় শেষে দেখিল যে তাহার বত্রিশ টাকা নয় আনা সাড়ে তিন পয়সার মাল বিক্রয় হইয়াছে। তাহার কত বিক্রয় হইয়াছে, অঙ্কে প্রকাশ কর।

(ছ) একজন খাজানা ও সেস্ বাবত তেইশ টাকা পাঁচ আনা আধপয়সা আদায় দিয়া চেক লইয়া আসিল। চেকে টাকার পরিমাণ অঙ্কে কিভাবে লেখা ছিল দেখাও।

(জ) তোমাদের সংসারের জন্য গত বৎসর আটাত্তর টাকা তের আনা দুই পয়সার কাপড়জামা লাগিয়াছিল। কাপড়জামার খরচ অঙ্কে প্রকাশ কর।

২। কথায় প্রকাশ কর (টাকা, আনা, গণ্ডা, কড়ায়)

(১) ৩।৶০
(২) ৮৸৶১০
(৩) ৯৷৷৴১৫
(৪) ১৪৸৴৫
(৫) ৩২।৶১২৷৷

৩। কথায় প্রকাশ কর (টাকা, আনা, পয়সায়)

(১) ৫৷৷/০
(২) ৭।৶১৫
(৩) ১২।/৭৷৷
(৪) ৫৬৷৷৴১০
(৫) ৩০৫।/৫

৪। অঙ্কে লিখ—

৫ টাকা ৫ আনা; ৭৫ টাকা ৮ আনা ১৫ গণ্ডা; ৬৮ টাকা ১৩ আনা ১০ গণ্ডা; ৮০ টাকা ১০ আনা ২ পয়সা; ২৫ টাকা; ১৫ টাকা ৩ পয়সা; ৫৫৫ টাকা ১ পয়সা; ৮ টাকা ১৪ আনা ১৭ গণ্ডা ২ কড়া; ১৮ টাকা ১২ আনা সাড়ে ৩ পয়সা; ২৭ টাকা ১১ আনা আধ পয়সা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লঘুকরণ

কাজ—

তোমরা ঠিক করিলে নৌকায় চড়িয়া অথবা বাসে চড়িয়া কিছু দূর বেড়াইয়া আসিবে। প্রত্যেক মাথা পিছু ⁄১০ আনিয়া দেখা গেল ৭৮টি পয়সা, ১৮টি এক আনা ও ১৫টি দুই আনা উঠিয়াছে, মোট কত উঠিয়াছে?

ইহা বাহির করিতে গেলে প্রথমে ৭৮টি পয়সায় কত টাকা কত আনা কত পয়সা, ১৮টি আনায় কত টাকা কত আনা ও ১৫টি দুই আনায় কত টাকা কত আনা বাহির করিতে হইবে। যে নিয়মে ইহা বাহির করা যায় তাহাকে ঊর্ধ্বগ লঘুকরণ বলে।

মোট দেখা গেল ৪৶১০ পয়সা উঠিয়াছে। প্রত্যেকে ⁄১০ পয়সা করিয়া দিয়া থাকিলে কতজন চাঁদা দিয়াছে? ইহা বাহির করিতে গেলে ৪৶১০ পয়সায় কত পয়সা তাহা বাহির করিয়া ৬ দিয়া ভাগ দিতে হইবে। যে উপায়ে ৪৶১০ পয়সাতে কত পয়সা বাহির করিতে হইবে, তাহাকে নিম্নগ লঘুকরণ বলে।

এই অধ্যায়ে এই নিয়ম দুইটিই শেখান হইল।

তোমরা জান, একটি টাকা ভাঙ্গাইলে ১৬টি আনি পাওয়া যায়; কেননা এক টাকা ষোল আনার সমান। ২টি টাকা ভাঙ্গাইলে ২ বার ১৬ আনা অর্থাৎ ৩২ আনা পাওয়া যায়; ৩টি টাকা ভাঙ্গাইলে ৩ বার ১৬ আনা অর্থাৎ ৪৮ আনা পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যতগুলি টাকা ভাঙ্গান হয়, ততবার ১৬ আনা পাওয়া যায়। অতএব টাকার সংখ্যাকে ১৬ গুণ করিলেই আনার সংখ্যা পাওয়া যায়। দেখা যাক, ৩।৵ আনায় কত আনা হয়। ৩ টাকা = ৩×১৬ আনা = ৪৮ আনা। অতএব ৩।৵ আনা = ৪৮+৫ আনা = ৫৩ আনা।

আবার তোমরা জান, ৪ পয়সায় এক আনা হয়। সুতরাং টাকাকে আনায় লওয়ার মত আনাকে পয়সায় লইতে ৪ গুণ করিতে হয়।

৫ আনা = ৫×৪ পয়সা = ২০ পয়সা।

৩।/০ আনা = ৫৩ আনা = ৫৩×৪ পয়সা = ২১২ পয়সা।

৩।/০ আনা যখন ২১২ পয়সার সমান, তখন ২১২ পয়সা দিয়াও ৩।/০ আনা পাওয়া যাইবে। তাহা কিরূপে হিসাব করা হয়, দেখা যাউক। দেখ, ৪টি পয়সা দিলে ১টি আনি পাওয়া যায়। এখন ২১২ পয়সার মধ্যে ৪ পয়সা আছে ৫৩ বার।

```
   ৫৩
 ------
৪)২১২
   ২০
 ------
    ১২
    ১২
 ------
     ×
```

সুতরাং, ২১২ পয়সা = ৫৩ আনা।

আবার, ৫৩ আনার মধ্যে ১৬ আনা আছে ৩ বার

```
      ৩ ... বার
   ------
১৬) ৫৩
    ৪৮
   ------
     ৫ অবশিষ্ট
```

সুতরাং ৫৩ আনার মধ্যে টাকা আছে ৩টি এবং ৫ আনা অতিরিক্ত আছে।

অতএব ২১২ পয়সা = ৩।/০ আনা।

এখন দেখা যাইতেছে, টাকা আনা প্রভৃতিকে যেমন পয়সায় প্রকাশ করা যায়, পয়সাকেও তেমনি টাকা আনা প্রভৃতিতে প্রকাশ করা যায়। এই প্রকার প্রকাশ করাকেই **লঘূকরণ** বলে। টাকার মূল্য বেশী, পয়সার

মূল্য কম। এইজন্য টাকাকে পয়সায় পরিণত করার মত বড়কে ছোটতে পরিণত করাকে **নিম্নগ** লঘূকরণ এবং পয়সাকে টাকায় পরিণত করার মত ছোটকে বড়তে পরিণত করাকে **ঊর্ধ্বগ** লঘূকরণ বলে।

টাকাকে পয়সাতে বা পয়সাকে টাকাতে পরিণত করার মত, মণ সের প্রভৃতিকে ছটাকে ও ছটাককে মণ সেরে, বৎসর মাসকে দিনে, আবার দিনকে মাসে বৎসরে, মাইলকে ফুট ইঞ্চিতে ও ফুট ইঞ্চিকে মাইল গজে প্রকাশ করা যায়।

এই সব লঘূকরণের জন্য নিম্নলিখিত তালিকাগুলি শেখা তোমাদের বিশেষ দরকার।

(১) মুদ্রাবিষয়কঃ—

৪ পয়সা = ১ আনা
১৬ আনা = ১ টাকা

এখন বাজারে ১ পয়সার কম কোন মুদ্রার প্রচলন নাই। পয়সার নীচে পাই নামক মুদ্রা দিয়া হিসাব করা হইলেও পাই মুদ্রার প্রচলন অতি বিরল। কড়া গণ্ডার ব্যবহার বহুপূর্বেই লোপ পাইয়াছে।

(২) ওজন বিষয়কঃ—

(ক) ১৬ ছটাক=১ সের
৪০ সের =১ মণ

(খ) ১৬ আনা=১ তোলা বা ভরি
৫ তোলা=১ ছটাক

ধান, চাল, কাঠ, কয়লা প্রভৃতির ওজনে (ক) তালিকা ব্যবহৃত হয়। ডাকের চিঠিপত্র, সোনারূপা প্রভৃতির ওজনে (খ) তালিকা ব্যবহৃত হয়।

(৩) দৈর্ঘ্য বিষয়কঃ—

১২ ইঞ্চি = ১ ফুট
৩ ফুট = ১ গজ
২২ গজ = ১ চেইন

১০ চেইন = ১ ফার্লং
৮ ফার্লং = ১ মাইল
২ মাইল = ১ ক্রোশ

বাঙলাদেশে পূর্বে যে সব দৈর্ঘ্য মাপ ছিল, এখন সে সব চলে না। শুধু ১৮ ইঞ্চি = ১ হাত ও ২ হাতে ১ গজ ক্ষেত্রবিশেষে ধরা হয়। চেইন মাপেরও কোন সাধারণ ব্যবহার নাই। ১৭৬০ গজে ১ মাইল ধরা হয়।

(৪) সময় বিষয়কঃ—

৬০ সেকেণ্ড = ১ মিনিট	৭ দিন = ১ সপ্তাহ
৬০ মিনিট = ১ ঘণ্টা	৩০ দিন = ১ মাস
২৪ ঘণ্টা = ১ দিন	১২ মাস = ১ বৎসর

সাধারণ হিসাবে ৩০ দিনে ১ মাস ধরা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল মাস ৩০ দিনে নহে। এইজন্য বৎসরে ৩৬০ দিন না থাকিয়া ৩৬৫ দিন থাকে।

(৫) গণনামূলকঃ—

৪ টা = ১ গণ্ডা	ইংরাজী মতেঃ—
৫ গণ্ডা = ১ বুড়ি	১২ টা = ১ ডজন
৪ বুড়ি = ১ পণ	১২ ডজন = ১ গ্রোস
১৬ পণ = ১ কাহন	

(৬) সূতা গণনা বিষয়কঃ—	(৭) চলতি পাইঘটিত মুদ্রা বিষয়কঃ—
৪ ফুট = ১ তার	৩ পাই = ১ পয়সা
৪০ তার = ১ পাটি	৬ পাই = ২ পয়সা
৪ পাটি = ১ লাটি	৯ পাই = ৩ পয়সা
৪ লাটি = ১ গুণ্ডি	১২ পাই = ১ আনা।

লঘূকরণের উদাহরণ

(১) ১৩।৶১০ পয়সায় কত পয়সা?

```
 ১৬
─────
 ৭৮
১৩
─────
২০৮ আনা
  ৬ আনা
─────
২১৪ আনা
  ৪
─────
৮৫৬ পয়সা
  ২ পয়সা
─────
৮৫৮ পয়সা।
```

১৩৲ টাকাকে ১৬ গুণ করিয়া গুণফলের সহিত ৬ যোগ করিয়া মোট ২১৪ আনা হইল। ২১৪কে ৪ গুণ করিয়া গুণফলের সহিত ২ পয়সা যোগ করিয়া মোট ৮৫৮ পয়সা হইল।

(২) মণ ৭॥২॥৶০ ছটাকে কত ছটাক?

```
৭॥২॥৶০ ছটাক
 ৪০
─────
২৮০ সের
 ২২ সের
─────
৩০২ সের
 ১৬
─────
৪৮৩২ ছটাক
  ১১ ছটাক
─────
৪৮৪৩ ছটাক
```

৭ মণকে ৪০ গুণ করিয়া গুণফলের সহিত ২২ যোগ করিয়া মোট ৩০২ সের হইল। ৩০২কে ১৬ গুণ করিয়া গুণফলের সহিত ১১ যোগ করিয়া মোট ৪৮৪৩ ছটাক পাওয়া গেল।

(৩) ১০২৪ পয়সায় কত টাকা?

```
       ২৫৬ আনা                 ১৬ টাকা
  ৪ ) ১০২৪ পয়সা        ১৬)২৫৬ আনা
       ৮                     ১৬
       ২২                    ৯৬
       ২০                    ৯৬
        ২৪                    ×
        ২৪
        ×
```

১০২৪ পয়সাকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া ২৫৬ আনা পাওয়া গেল। ২৫৬ আনাকে ১৬ দিয়া ভাগ করিয়া ১৬৲ টাকা হইল। সুতরাং ১০২৪ পয়সা = ১৬৲ টাকা।

(৪) ৭৫৩০ ফুটে কত গজ, মাইল?

```
       ২৫১০ গজ                   ১ মাইল
  ৩ ) ৭৫৩০ ফুট        ১৭৬০ )২৫১০ গজ
       ৬                     ১৭৬০
       ১৫                     ৭৫০ গজ
       ১৫
        ৩
        ৩
        ×
```

৭৫৩০ ফুটকে ৩ দিয়া ভাগ করিয়া ২৫১০ গজ হইল। ২৫১০ গজকে ১৭৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ১ মাইল পাওয়া গেল এবং ৭৫০ গজ অবশিষ্ট রহিল। অতএব ৭৫৩০ ফুট = ১ মাইল ৭৫০ গজ।

প্রশ্নমালা ৮

১। মুখে মুখে বলঃ—

কয় ছটাকে এক মণ?
দশ গজে কয় ইঞ্চি?
কয় সেরে দশ মণ?
দশ ছটাকে কত তোলা?
একশ আনায় কত ভরি?
এক সপ্তাহে কয় ঘণ্টা?
৪০০ টাতে কয় পণ?
চার ছটাকে কত কাঁচ্চা?
দশ টাকায় কত পয়সা?
পাঁচ পণে কয়টা?
৪০০ সেরে কত মণ?
৭২ ইঞ্চিতে কয় ফুট?

৬৪০ তার সূতায় কয় গুণ্ডি?
তিন পাটিতে কয় তার সূতা?
এক ঘণ্টায় কয় সেকেণ্ড?
৩২০ ফুট সূতায় কয় পাটি?
৩২০ ছটাকে কয় সের?
১২০ ঘণ্টায় কয় দিন?
১ কাহন কড়িতে কয়টা কড়ি?
৫ হাত লম্বা দড়ি কয় ইঞ্চি লম্বা?
১ পাটি সূতা কয় ফুট লম্বা?
এক ক্রোশে কত গজ?
কয়পাটি সূতায় দুই গুণ্ডি?
৬০টাতে কয় ডজন?

একশ আনায় কয় টাকা কয় আনা?

২। (ক) পয়সায় পরিণত কর—৭৲; ৫।৵০; ১৫৸১০; ৩৫৸/১৫।

(খ) পাইতে পরিণত কর—১৲; ৷৵৪ পাই; ৩।/৪ পাই; ১৬৷৵৬ পাই।

(গ) ছটাকে পরিণত কর—।২ সের; /৫৷৵০; ১৸১।/০।

(ঘ) তোলায় পরিণত কর—/৷০; /১।৵০; /৩৶০; ।২৷/০।

(ঙ) ফুটে পরিণত কর—১০ গজ ২ ফুট; ২২ গজ ১ ফুট; ১ মাইল ৬ গজ ২ ফুট; ১ ক্রোশ।

(চ) ইঞ্চিতে পরিণত কর—৩ গজ ২ ফুট; ১০ গজ ১ ফুট; ১২ গজ ১ ফুট ১০ ইঞ্চি; ২০ গজ।

(ছ) দিনে পরিণত কর—২ মাস ১৩ দিন; ৫ মাস ১০ দিন; ৪ বৎসর; ২ বৎসর ৩ মাস ৪ দিন।

(জ) সেকেণ্ডে পরিণত কর—৩ ঘণ্টা; ৫ ঘণ্টা ১০ মিনিট; ১ দিন; ১ সপ্তাহ।

(ঝ) তারে পরিণত কর—৪ পাটি সূতা; ১ গুণ্ডি ৩ লাটি সূতা; ২ লাটি ৩ পাটি সূতা; ৭ গুণ্ডি ১০ পাটি সূতা।

৩। (ক) টাকা আনায় পরিবর্তিত কর—২২০ পয়সা; ২৩৬ পয়সা; ৫৩৯ পয়সা; ৮৪০ পয়সা।

(খ) মণ সেরে পরিবর্তিত কর—২৫৬ ছটাক; ৪০০ ছটাক; ৬৪ ছটাক; ৪০৮ তোলা; ৬৮০ তোলা।

(গ) গজ ফুটে পরিবর্তিত কর—১০০ ইঞ্চি; ১২০ ইঞ্চি; ৭৭ ফুট; ৮৪ ফুট।

(ঘ) ঘণ্টা মিনিটে পরিবর্তিত কর—৩৬০ সেকেণ্ড, ৩৬০ মিনিট; ৪২০ মিনিট; ৭৬০ সেকেণ্ড।

(ঙ) মাস বৎসরে পরিবর্তিত কর—৭৩ দিন; ২১৯ দিন; ৮৪০ দিন; ১০০০ দিন।

৪। সেদিন তোমাদের প্রত্যেককে সূতা কাটিবার জন্য /৵০ ছটাক করিয়া তূলা দেওয়ায় মোট /২॥০ সের তূলা লাগিয়াছে। তোমরা কয়জনে তূলা লইয়াছ?

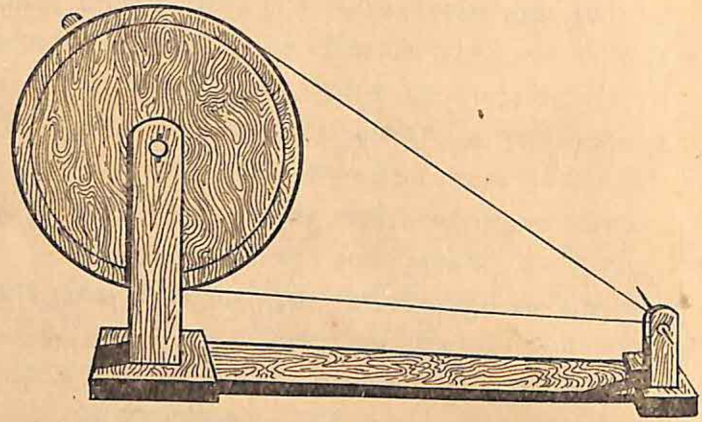
৫। চড়ুইভাতিতে তোমরা প্রত্যেকে ॥৵০ করিয়া দিয়া মোট ১৫॥৵০ চাঁদা তুলিয়াছ। তোমরা দলে কয়জন?

৬। একটি বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে প্রত্যহ এক পোয়া করিয়া দুধ খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে প্রত্যহ ১ মণ ১৪ সের দুধ লাগে। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কত?

৭। একজন কৃষকের ১॥২ সের বেগুন ছিল। ৬টি বেগুনের ওজন /২ সের হইলে তাহার নিকট কতগুলি বেগুন ছিল?

৮। তুমি ৫৩ গজ ১ ফুট সূতা কাটিয়াছ। তুমি কত তার সূতা কাটিয়াছ?

৯। ১ ইঞ্চি সূতা কাটিতে যদি ৪টি পাকের প্রয়োজন হয়, তবে ১ গুণ্ডি ২০ তার সূতা কাটিতে চরকার চাকা কত পাক ঘুরিবে?



১০। তোমার চরকার বড় চাকার বেড় ২ ফুট, ছোট চাকার পুলির বেড় ২ ইঞ্চি, ছোট চাকার বেড় ৬ ইঞ্চি, টেকোর পুলির বেড় ১ ইঞ্চি। বড় চাকা একবার ঘুরিলে টেকো কতবার ঘুরিবে?

সপ্তম অধ্যায়

মিশ্র যোগ ও বিয়োগ

কাজ—

১। এর আগে তোমরা লাইব্রেরীর বইএর খাতায় কোন্‌টির কত দাম লিখিয়া রাখিয়াছিলে। এখন তোমাদের হিসাব করিয়া দিতে বলা হইয়াছে যে এই পর্যন্ত লাইব্রেরীতে কত টাকার বই কেনা হইয়াছে। সুতরাং সেই হিসাব তোমাদের করিয়া দিতে হইবে।

২। সরস্বতী পূজা, বনভোজন বা অন্য কোনও উৎসবের জন্য শুধু চাঁদা তুলিয়া লিখিয়া রাখিলেই চলিবে না। মোট কত চাঁদা উঠিল তাহার

হিসাব করিতে হইবে। সরস্বতী পূজা, বা উৎসবের যাবতীয় জিনিস তোমাদের কিনিতে হইবে ও প্রত্যেকটির হিসাব লিখিয়া রাখিতে হইবে। তারপর পূজার শেষে বা উৎসবের শেষে কত তোমাদের হাতে রহিল হিসাবের খাতায় তাহা লিখিয়া রাখিবে।

৩। তোমাদের দোকানে কত টাকার জিনিস ছিল, কত টাকার বিক্রি হইয়াছে ও এখন কত টাকার জিনিস আছে তাহা হিসাব করিয়া দিতে হইবে।

এজন্য এই অধ্যায়ে মিশ্র যোগ বিয়োগ কিভাবে করিতে হয় তাহা দেখান হইল।

তোমার নিকট ৩।/১০ পয়সা ও তোমার ভাইয়ের নিকট ২৷৷৶১৫ আছে। তোমাদের দুইজনের নিকট মোট কত আছে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি দুইজনের টাকা একত্র করিয়া গুণিবে। এই একত্র করাকেই বলে যোগ। এই যোগ করিলে কত হইবে? তোমার ২ পয়সা ও তোমার ভাইয়ের ৩ পয়সায় মোট ৫ পয়সা হইল। ইহার ৪ পয়সায় ১ আনা হইল, একটি পয়সা বাকী থাকিল। এই ১ আনা, তোমার ৫ আনা ও তোমার ভাইয়ের ১১ আনায় মোট ১৭ আনা হইল। ১৭ আনায় ১ টাকা ১ আনা। ১ আনা বাকী রাখিয়া এই টাকাটি, তোমার ৩ টাকা ও তোমার ভাইএর ২ টাকায় মোট ৬ টাকা হইল। সুতরাং তোমাদের উভয়ের নিকট ৬/৫ পয়সা আছে। নীচের যোগগুলি দেখ। (-) চিহ্ন দিয়া বড় বড় যোগও কেমন করিয়া করতে হয় তাহা নীচে দেখান হইল।

(১) ৩।/১০ পয়সা
২৷৷৶১৫ "
—————
৬ / ৫ "

(২) ৭ /১৫ পয়সা
৫৷৷/১০ "
৪৷৶ ৫ "
৮৸ ১৫ "
৯ ।৶১৫ "
—————
৩৫ ।৶০

৩ পয়সা+২ পয়সা=৫ পয়সা=১ আনা ১ পয়সা=আনার জন্য একটি "দাগ" (-) দিয়া পয়সাটি নীচের পয়সার সহিত যোগ করা হইল। ১ পয়সা +১ পয়সা+৩ পয়সা=৫ পয়সা=/৫ পয়সা—আবার আনার জন্য একটি "দাগ" দিয়া পয়সাটি নীচের ৩ পয়সার সহিত যোগ করিয়া এক আনা হইল। তাহার জন্য শেষে আবার আনার "দাগ" হইল।

এখন পয়সার ঘরে ৩টি আনার "দাগ" পাওয়া গেল। এই ৩ আনা আনার ঘরে যোগ করিয়া উপর হইতে পাওয়া যায়—৩ আনা+১ আনা+৯ আনা+৬ আনা=১৯ আনা=১ টাকা ৩ আনা। এখন ৷৵৹র নীচে টাকার জন্য "দাগ" পড়িল; ৩ আনা নীচের ১২ আনা ও ৭ আনার সহিত যোগ করিয়া হইল ২২ আনা=১ টাকা ৬ আনা। নীচে আবার "দাগ" পড়িল। ৬ আনা আনার ঘরে নীচে বসিল। আনার ঘরে টাকার ২টি "দাগ" আছে। এই ২ টাকা টাকার ঘরের টাকার সঙ্গে যোগ করিয়া হইল ৩৫ টাকা। অতএব যোগফল=৩৫৷৵৹

(৩) ৫।৭।৶০ ছটাক	
৪।৩॥/০ "	
৭ /৫৵০ "	
৯॥ ২ "	
২৬।৮৵০ "	

৭ ছটাক+৯ ছটাক=১৬ ছটাক=১ সের সেরের জন্য "দাগ" রাখিয়া বাকী ২ ছটাক নীচে নামিল। এই ১ সের+৭ সের +৩ সের=১১ সের; দশ সের বা ।০এর জন্য "দাগ" রাখিয়া বাকী ১ সের +৫ সের +২ সের=৮ সের নীচে নামিল। হাতের ।০+।০+।০+॥০=১।০; নীচে নামিল ।০ এবং ১ মণ মণের ঘরে যোগ হইয়া ২৬ মণ হইল। সুতরাং যোগফল=২৬।৮৵০ ছটাক।

তোমার নিকট ৩॥/১০ পয়সা ছিল। তাহা হইতে তুমি ১৷৵০ দিয়া একখানা বই কিনিলে। এখন তোমার নিকট কত আছে? নয় আনা হইতে ছয় আনা গিয়া তোমার নিকট ৶০ থাকিল; আর ৩ টাকা হইতে ১ টাকা গিয়া তোমার নিকট ২ রহিল। পয়সা ২টি যেমন ছিল, তেমনই রহিল। সুতরাং তোমার নিকট এখন থাকিল ২৶১০ পয়সা। এখানে তোমার মোটা টাকা হইতে বইএর দাম পৃথক্ করা হইল। এই পৃথক্

করাকে বিয়োগ করা বলে। নীচে অঙ্ক লিখিয়া কিরূপে বিয়োগ করা হয় দেখ।

(১) ৭।৶১৫ পয়সা ৩।/১০ „ ——— ৪৶ ৫ „	৩ পয়সা হইতে ২ পয়সা গিয়া ১ পয়সা নামে। ৭ আনা হইতে ৫ আনা গিয়া ২ আনা থাকে। ৭৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা গিয়া ৪৲ টাকা থাকে।
(২) ৮॥৶ ৫ পয়সা ৫।/১০ „ ——— ৩।/১৫ „	১ পয়সা হইতে ২ পয়সা বিয়োগ হয় না। ১ পয়সার স্থলে ১ আনায় ৪ পয়সা বেশী লইয়া ৫ পয়সা ধর। ৫ পয়সা হইতে ২ পয়সা বাদ দিয়া ৩ পয়সা নামিল। এখন উপরে ১

আনা বেশী লওয়া হইয়াছে। সুতরাং ১ আনা বেশী বিয়োগ করিতে হইবে। এই ১ আনা ও নীচের ৫ আনা একত্র ৬ আনা হয়। ১১ আনা হইতে ৬ আনা গিয়া ৫ আনা নামে। ৮৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা গিয়া ৩৲ টাকা নামে।

প্রক্রিয়াটি নিম্নে অন্যভাবে দেখান গেল—

টাকা আনা পয়সা	টা আ প	
৮ — ১১ — ১ এর স্থলে	৮—১১—৫	(১ পয়সার স্থলে ৫ পয়সা ধরিয়া ১ আনা বেশী ধরা হইল)
৫ — ৫ — ২ এর স্থলে	৫— ৬—২	(৫ আনার স্থলে ৬ আনা ধরিয়া ১ আনা বেশী লওয়া হইল)
	৩— ৫—৩	

উপরে পয়সার ঘরে যেমন ১ আনা বেশী ধরা হইল, নীচেও তেমনি আনার ঘরে ১ আনা বেশী ধরা হইল। সুতরাং বিয়োগফল ঠিকই থাকিল। উপরের রাশি ছোট হইলেই এইভাবে বিয়োগ করিতে হয়।

নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি ভাল করিয়া দেখ—

		টা	আ	প
(৩)	১০।৶ ৫ পয়সা →	১০ —	২৩ —	৫
	৫।।৵১৫ পয়সা →	৬ —	১১ —	৩
	৪৸ ১০ "	৪ —	১২ —	২

উপরের আনা নীচের আনা হইতে কম বলিয়া উপরে আনার ঘরে ১৬ আনা যোগ করা হইল। নীচেও টাকার ঘরে ১ টাকা বাড়ান হইল। এখন উপরে আনা হইল ২৩ এবং নীচে টাকা হইল ৬টি। আবার উপরের পয়সা নীচের পয়সা অপেক্ষা কম বলিয়া উপরে পয়সার ঘরে ৪ পয়সা বাড়ান হইল; তজ্জন্য নীচেও আনার ঘরে ১ আনা বাড়ান হইল। ইহাতে উপরে হইল মোট ১০ টাকা ২৩ আনা ৫ পয়সা এবং নীচে হইল ৬ টাকা ১১ আনা ৩ পয়সা। এখন নীচের রাশিগুলি সহজেই বিয়োগ করা গেল। বিয়োগফল হইল ৪ টাকা ১২ আনা ২ পয়সা = ৪৸১০ পয়সা।

(৪) ৫।।২।।৶০ ছটাক
৩।৫।।০ "
২৴৭৶০ "

উপরের ১১ ছটাক হইতে ৮ ছটাক গিয়া ৩ ছটাক নামিল। উপরের ২ সের হইতে ৫ সের বিয়োগ হয় না। তজ্জন্য ১০ সের বাড়াইয়া ১২ সের হইল; তাহা হইতে ৫ সের গিয়া ৭ সের নামিল। নীচেও ১০ সের বাড়িয়া ।।০ হইল। উপরের ।।০ হইতে নীচের ।।০ বিয়োগ গিয়া কিছুই নামিল না। ৫ মণ হইতে ৩ মণ গিয়া ২ মণ নামিল। সুতরাং বিয়োগফল = ২৴৭৶০ ছটাক।

(৫) ৪৴৭।৴০ ছটাক
২।২।।৴০ "
১৸৪৸০ "

৫ ছটাক ৯ ছটাক হইতে কম বলিয়া তাহার সহিত ১ সের = ১৬ ছটাক লইয়া মোট উপরে হয় ২১ ছটাক। তাহা হইতে ৯ ছটাক গিয়া নামিল ১২ ছটাক। উপরের ৭ সের হইতে ৩ সের গিয়া ৪ সের নামিল। এখন নীচে ।০ বা দশ সের আছে, উপরে

কিছু নাই। উপরে ১ মণ=চার চোক ধরিয়া তাহা হইতে ১ চোক গিয়া ৩ চোক নামিল। এখন উপরের ৪ মণ হইতে ৩ মণ গিয়া ১ মণ নামিল। সুতরাং বিয়োগফল=১৸৪৸৹ ছটাক।

প্রশ্নমালা ৯

১। নীচের রাশিগুলি যোগ কর:—

৫ ৶৹ আনা	৫৷৵৬ পাই	৫৷৷ ১৶৹ ছটাক
৭৷৷৴৹ "	৩৷৷৴৩ "	৩৷ ৭৷৹ "
৯ ৴৹ "	৪৷৶৯ "	৪ ৴১৷৷৴৹ "

৬৷৷৵১০ পয়সা	৭ ৴৭ ৷৶৹ ছটাক	১২৷৷৵৯ পাই
৭ ৴১৫ "	১১৷ ১৷৷৶৹ "	২৫৷৶৬ "
৫৸৴১০ "	১৫৷ ৫৸৶৹ "	৬৷৷৶৬ "
৯ ৶ ৫ "	১৬ ৴৫৷৶৹ "	১৩৷৴৯ "
		৮ ৶৬ "
		৭৷৷৴৩ "

২। উপরটি হইতে নীচেরটি বিয়োগ কর:—

৫৷৷৵৹ আনা	৫৷৶৬ পাই	৯৷৷৵১০ পয়সা
৩৷৴৹ "	৩৷৷৶৯ "	৫৷৷ ৫ "

৯২৷৵১০ পয়সা	৭৸৶৹ আনা	১২ ৴ ৫ পয়সা
৮০৷৷৶ ৫ "	৫৷৴৹ "	১০৸৶১৫ "

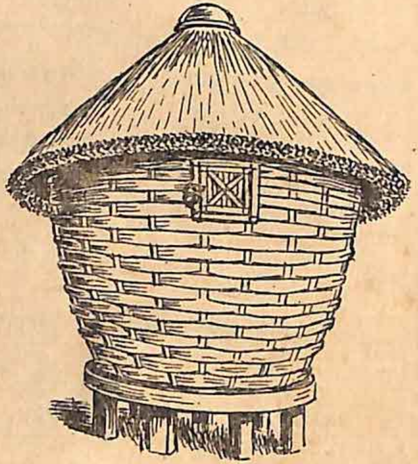
৬৷৷৭৸৵৹ ছটাক	৮৸৫৸৹ ছটাক	২০৴৹
৩৷৫৷৷৵৹ "	৬৷৷৩৷৵৹ "	১৫৷৭৸৴৹ ছটাক

৩। তোমার নিকট ৩৷৷৹ টাকা ছিল। তুমি ১৷৹ দিয়া একখানি বই এবং ৷৷৵৹ দিয়া একখানি খাতা কিনিলে। এখন তোমার নিকট কত আছে?

৪। এক সপ্তাহে রাম ২ লাটি ৩ পাটি, শ্যাম ১ লাটি ১ পাটি ২৫ তার, যদু ২ লাটি ১ পাটি ২০ তার এবং মধু ২ লাটি ২ পাটি ১০ তার সূতা কাটিতে পারে। সপ্তাহে সকলে কত লাটি সূতা কাটে?

৫। তোমার নিকট ২৷৵১০ পয়সা আছে। তোমার দাদার নিকট ৩৷৶৫ পয়সা আছে। তাহার নিকট কত বেশী আছে?

৬। একজন মজুরের পিঠে ১৷২৷৹ ছটাক ভার ছিল। অন্য একজনের পিঠে ১৷৪৷৹ ছটাক ভার ছিল। প্রথম মজুরের ভার হইতে কত ওজন দ্বিতীয় মজুরের ভারে দিলে দ্বিতীয় মজুরের ভার ১৷৹ মণ হইবে? প্রথম মজুরের ভার তখন কত থাকিবে?



৭। একজন কৃষক ৪০৴৹ মণ ধান একটি গোলায় রাখিয়াছিল। তাহা হইতে ১০৷৹ সের বিক্রয় করার পর গোলায় আগুন লাগিয়া কিছু ধান পুড়িয়া গেল। আগুন নিভাইবার পর সে ৭৷৩৷৹ ছটাক ধান পাইল। কত ধান পুড়িয়া গেল?

৮। একজন দুগ্ধব্যবসায়ী ৩৷৬ সের দুধ কিনিল। জল মিশাইয়া সেই দুধ সে ।৹ আনা সের দরে বেচিতে লাগিল। সমস্ত দুধ বেচিয়া তাহার ৪০৲ টাকা হইল। সে কত জল মিশাইয়াছিল?

অষ্টম অধ্যায়

দোকানের বিক্রয় রসিদ ও বিল তৈয়ারী করা ও তাহা পরীক্ষা করা

আমরা যখন কোন দোকানে গিয়া কোন জিনিস কিনি, তখন দোকানদার বা তাহার কোন কর্মচারী জিনিসের মূল্য লইয়া তাহার একটি রসিদ দিয়া থাকে। ইহাকে বিক্রয় রসিদ বলে। নিম্নে একটি বিক্রয় রসিদের নমুনা দেওয়া হইল।

বিক্রয় রসিদ

ক্রমিক নং ৫৩

কমলা ভাণ্ডার

শান্তিপুর, নদীয়া

কাপড়কাচা সাবান ১টা—	।৵০
নীল—	৴১০
কাগজ ১ দিস্তা—	॥৵০
মোমবাতি ২—	।/০
কাচের গেলাস ১—	৶১০
চিরুনি ১—	।৶০

মূল্য— ২৲

বিক্রয় কর— /১০

মোট—২/১০

বিক্রেতা—উপেন দাস

তাং ১০।৫।৫৭

রসিদটি ভাল করিয়া দেখ। ক্রমিক নং ৫৩—ইহার অর্থ এই বিক্রয়ের পূর্বে আরও ৫২খানা রসিদ অন্যান্য ক্রেতাকে দেওয়া হইয়াছে। মাঝখানে জিনিসের নাম ও মূল্য লেখা আছে। মোট মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৻১৫ হিসাবে বিক্রয় কর লওয়া হইয়াছে। তাহাতে ক্রেতাকে মোট ২/১০ পয়সা দিতে হইয়াছে। দোকানে যে লোক মূল্য লইয়াছে, সব নীচে তাহার নাম সহি আছে।

তারিখের ঘরে প্রথম সংখ্যাটি মাসের দিন, দ্বিতীয়টি মাসের সংখ্যা ও তৃতীয়টি ১৩৫৭ সালের শেষ দুইটি অঙ্ক। মাসের সংখ্যার বেলা বৈশাখকে ১ ধরা হয় এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় প্রভৃতিকে যথাক্রমে ২, ৩ ইত্যাদি ধরা হয়। এখানে ৫ দ্বারা ভাদ্র মাসকে বুঝাইতেছে।

বিক্রয় রসিদের হিসাব

খুব লম্বা লম্বা বিক্রয় রসিদের হিসাব দোকানদারেরা বিশেষ তাড়াতাড়ি করিয়া থাকে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। তোমরা পূর্বেই '-' চিহ্ন দিয়া যোগ করিতে শিখিয়াছ। তাহারা সেই উপায়ে যোগ করে বলিয়া অক্লেশে বড় বড় যোগ অল্প সময়েই করিয়া থাকে। যোগ করিতে সর্বদা ঐ চিহ্নটি ব্যবহার করিয়া যোগ করিবে।

দোকানের বিল

প্রত্যেক গৃহস্থকেই প্রতিদিন নানা জিনিস পাড়ার মুদীর দোকান হইতে কিনিতে হয়। প্রতিদিন প্রত্যেকবার নগদ মূল্যে জিনিস কেনা বা বেচা উভয়ই অসুবিধাজনক। এই জন্য প্রতিদিন যে সমস্ত জিনিস গৃহস্থবাড়িতে যায়, দোকানদার তাহার নিজের একটা খাতায় তাহার পরিমাণ ও মূল্য লিখিয়া রাখে। মাসান্তে ঐ সব জিনিস ও মূল্যের একটা ফর্দ গৃহস্থকে দেয়। তিনি তাহা দেখিয়া দোকানদারের পাওনা মিটাইয়া দেন। কিন্তু দাম দিবার পূর্বে গৃহস্থ হিসাব ঠিক হইয়াছে কি

না পরীক্ষা করিয়া দেখেন। দোকানদারের এই ফর্দকে দোকানের 'বিল' বলে। নিম্নে কয়েকটি ছোট বিলের নমুনা দেখান হইতেছে।

বিলের উদাহরণ (১)

নং ১২

সুলভ ভাণ্ডার

রূপপুর, বীরভূম

ক্রেতা—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সাহা
সাং—রূপপুর।

তাং	দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ		দর	দাম
২।৩।৫৭	চাউল ১/০	...	২০৲	হিঃ ২০৲
	লবণ /৫	...	৵০	হিঃ ॥৵০
	সঃ তৈল /৫	...	৩৲	হিঃ ১৫৲
৭।৩।৫৭	মুগ ডাইল /৫	...	১৲	হিঃ ৫৲
	নাঃ তৈল /২	...	৩॥০	হিঃ ৭৲

আজ বিলের টাকা বুঝিয়া পাইলাম—
শ্রীকমলচন্দ্র দে
৩।৪।৫৭

মোট মূল্য ... ৪৭॥৵০

মবলগে সাতচল্লিশ টাকা দশ আনা মাত্র

শ্রীকমলচন্দ্র দে

তাং
২।৪।৫৭

উদাহরণ (২)

নং ২৫

সাহা-মিত্র ভাণ্ডার

কালিকা বাজার, কুচবিহার

ক্রেতা—শ্রীপিনাকী প্রসাদ মিত্র

সাং—কালিকা বাজার

তাং	দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ	দর	দাম
৫।৪।৫৭	নাঃ দড়ি /২	... ১৷৷৹	হিঃ ৩৲
৯।৪।৫৭	আলকাতরা ।৹	... ২৪৲	হিঃ ৬৲
১৩।৪।৫৭	পেরেক ১″ /১৹	... ২৷৷৹	হিঃ ৩৵৹
২২।৪।৫৭	কোদাল ১	... ৩৲	হিঃ ৩৲
২৯।৪।৫৭	তর্কলি ২	... ১৲	হিঃ ২৲

অত্র বিলের টাকা বুঝিয়া পাইলাম
শ্রীসমরেন্দ্রকুমার সাহা

মোট মূল্য ... ১৭৵৹

মবলগে সতের টাকা দুই আনা মাত্র

তাং ২।৫।৫৭

শ্রীসমরেন্দ্রকুমার সাহা

উপরের দুইখানি বিল ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে দোকানদার যখন মূল্য বাবত কুড়ি টাকার বেশী পায় ও লয়, তখন তাহাকে একখানি এক আনার স্ট্যাম্পের উপর সহি করিয়া টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। ইহাই সরকার বাহাদুর কর্তৃক প্রচলিত আইন-সঙ্গত রীতি।

প্রশ্নমালা ১০ক

মূল্য-তালিকা

চাউল ২০৲ মণ	সরিষার তৈল ৩৷৵০ সের
মুগ ডাইল ১৷০ সের	নারিকেল তৈল ৩৷৷০ সের
মসুর ডাইল ৸৵০ সের	লবণ ৵০ সের
আটা ৷৷৵০ সের	চিনি ৸৵০ সের
লঙ্কা ৩৲ সের	বার্লি ৷৷৵০ কৌটা
হলুদ ১৷৷০ সের	মিছরি ১৷৷০ সের
ধনে ২৷৷০ সের	সাবু ৩৲ সের
সরিষা ১৷০ সের	চা ৩৲ পাউন্ড

উপরের মূল্য-তালিকা দেখিয়া নিম্নের বিলগুলি তৈয়ার কর—

(১)
চাউল /৫
মুঃ ডাইল /২
সঃ তৈল /১
চিনি /৷৷০

(২)
বার্লি ২ কৌটা
মিছরি /৷৷৵০
সাবু /৷০
চা ৷৷০ পাউন্ড

(৩)
লবণ /২৷৷০
লঙ্কা /৷০
হলুদ /৷৷০
সরিষা ৵০

(৪)
চাউল ৷০
মঃ ডাইল /১
সঃ তৈল /৷৷০
লবণ /৷০
চিনি /৷৷০

(৫)
চাউল /৫
আটা /৫
লবণ /৷৷০
চিনি /১
লঙ্কা //০

(৬)
আটা ৷০
লবণ /৷০
লঙ্কা /৵০
ধনে //০
হলুদ /৵০

প্রশ্নমালা ১০খ



মূল্য-তালিকা

শাড়ী ১২৲ জোড়া
ধুতি ৮॥০ জোড়া
প্যাণ্ট ৩।০ খানা
হাফশার্ট ৪৵০ খানা
গেঞ্জি ১৸০ খানা
সাবান ৸০ সের
সোডা ১৲ সের
নীলবড়ি /০
কোদাল ৪৲
কাস্তে ২৲

কাগজ ॥৵০ দিস্তা
চোষকাগজ ৵০ তা
পেন্সিল ৶০
দোয়াত ৵০
কালির বড়ি ৴১০
খন্তা ৸০
দড়ি ৸০ সের
পেরেক ২॥০ সের
লংক্লথ ১।৵০ গজ
মার্কিন ৸৵০ গজ

উপরের মূল্য-তালিকাটি দেখিয়া নিম্নের বিক্রয় রসিদগুলি তৈয়ার কর—

(১)	(২)	(৩)	(৪)
শাড়ী ৩খানা	ধুতি ১খানা	সাবান /১।৷০	কোদাল ১ খান
কাগজ ২ দিস্তা	প্যাণ্ট্ ২টা	নীলবড়ি ২টা	খন্তা ২ খান
চোষকাগজ ১টা	হাফশার্ট ৩টা	সোডা /৷৷০	কাস্তে ৫ খান
কালির বড়ি ২টা	গেঞ্জি ২টা	দোয়াত ১টা	দড়ি /৫

প্রশ্নমালা ১১

মূল্য-তালিকা

চাউল ২০৲ মণ	লবণ ৵০ সের	লংক্লথ ১৷৷০ গজ
সঃ তৈল ৩৷৵০ সের	চিনি ৸৵০ সের	মার্কিন ১৲ গজ
আটা ৸০ সের	চা ৩৲ পাউন্ড	সাবান ৸০ সের
নাঃ তৈল ৩৷৷০ সের	বার্লি ৷৷৵০ কৌটা	কাগজ ৷৷৵০ দিস্তা

উপরের তালিকা দেখিয়া নিম্নের বিল বা বিক্রয় রসিদগুলির হিসাব পরীক্ষা কর এবং ভুল থাকিলে সংশোধন কর—

(১)

চাউল /৫	...	২৷৷০
সঃ তৈল /১	...	৩৷৵০
আটা /২৷৷	...	১৸০
মোট মূল্য	...	৭৷৷৵০

(২)

চাউল ৷০	...	৫৲
আটা /৫	...	৩৸০
নাঃ তৈল /১	...	৩৷৷০
মোট মূল্য	...	১২৷৷০

(৩)

লংক্লথ ৪ গজ	...	৬৲
মার্কিন ১০ গজ	...	১০৲
সাবান /২	...	১৷০
মোট মূল্য...		১৭৷০

(৪)

আটা /৮	...	৬৲
লবণ /৷৷০	...	/০
চা ১ পা	...	৩৲
বার্লি ১ কৌটা	...	৷৷৶০
কাগজ ৩ দিস্তা	...	১৸০
মোট মূল্য...		১০৷৶০

(৫)

নং ৪

সমন্বয় ভাণ্ডার
গোপালপুর, বীরভূম
ক্রেতা শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

তাং	দ্রব্য	দর		দাম
৫।৫।৫৭	চাউল ৷০	... ২০৲	হিঃ	... ৫৲
	সঃ তৈল /২	... ৩৷৶০	হিঃ	... ৬৸০
১৬।৫।৫৭	আটা /৫	... ৸০	সের হিঃ	... ৩৸০
	চা ১ পা	... ৩৲	হিঃ	... ৩৲
	চিনি /১৷০	... ৸৶০	সের হিঃ	... ১৲১০
২৫।৫।৫৭	চাউল /৫	... ২০৲	হিঃ	... ২৷৷০
	লবণ /১	... ৶০	সের হিঃ	... ৶০
	সঃ তৈল /৷৷০	... ৩৷৶০	হিঃ	... ১৷৷৶০

মোট মূল্য ২৩৸/১০
মবলগে তেইশ টাকা সাড়ে তের আনা

তাং ২।৬।৫৭

শ্রীসত্যকিঙ্কর দত্ত

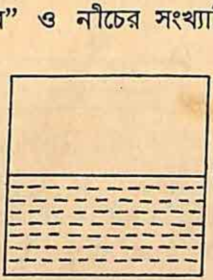
নবম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

ভগ্নাংশ

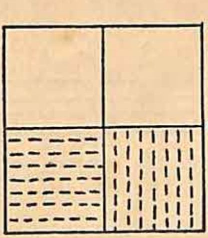
(ক) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ প্রভৃতির ব্যবহার

তোমরা জান একটি জিনিসকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগকে সমস্ত জিনিসের আধা বলা হয়; আর যদি সমান চার ভাগে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে এক একটি ভাগকে সিকি বলা হয়। আধা, সিকি প্রভৃতি অংশকে ভগ্নাংশ বলে, তাহা তোমরা পূর্বে শিখিয়াছ। ইহাদিগকে $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ এইরূপে অঙ্কে লেখা হয়, তাহাও তোমরা জান। সকল ভগ্নাংশই এই একই প্রকারে লেখা হয়। ৩ ভাগের ১ ভাগ বুঝাইতে $\frac{1}{3}$ লেখা হয়, ৫ ভাগের ২ ভাগ বুঝাইতে $\frac{2}{5}$ লেখা হয়। ভগ্নাংশের অঙ্কের উপরের সংখ্যাটিকে "লব" ও নীচের সংখ্যাটিকে "হর" বলে।



(১)

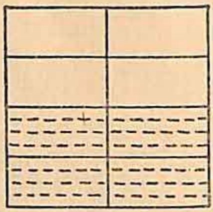
পার্শ্বের ১নং চিত্রে দেখ, একটি বড় চৌকাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এখানে নীচের দাগ দেওয়া অংশটি সমস্ত চৌকার আধা বা $\frac{1}{2}$; উপরের সাদা অংশটিও সমস্ত চৌকার আধা বা $\frac{1}{2}$।



(২)

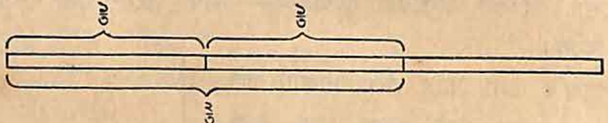
পার্শ্বের ২নং চিত্রে চৌকাটিকে সমান ৪ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এখানে একটি ছোট চৌকা বড় চৌকাটির সিকি বা $\frac{1}{4}$। আবার দুইটি ছোট চৌকা মিলিয়া বড় চৌকার আধার সমান। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ২ সিকি=১ আধা; অর্থাৎ ৪ ভাগের ২ ভাগ=২ ভাগের ১ ভাগ বা $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$।

পার্শ্বের ৩নং চিত্রে চৌকাটিকে ৮ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এখানে একটি ছোট ঘর চৌকার ৮ ভাগের ১ ভাগ বা $\frac{১}{৮}$। চারটি ছোট ঘর সমগ্র চৌকার ৮ ভাগের ৪ ভাগ বা $\frac{৪}{৮}$। সুতরাং $\frac{৪}{৮}=\frac{১}{২}$

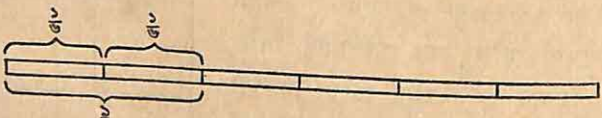

(৩)

তিনটি চিত্র হইতে এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে—

$$\frac{৪}{৮}=\frac{২}{৪}=\frac{১}{২}$$

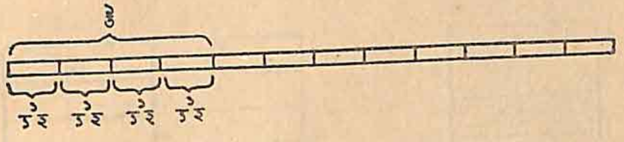


উপরে একটি লাঠিকে সমান ৩ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এখন প্রত্যেক অংশ সমগ্র লাঠির ৩ ভাগের ১ ভাগ বা $\frac{১}{৩}$; দুইটি অংশ একত্রে সমগ্র লাঠির ৩ ভাগের ২ ভাগ বা $\frac{২}{৩}$। আবার ঐ লাঠিটিকে সমান ৬ ভাগে



ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগ লাঠির $\frac{১}{৬}$ হইল। এই ছয় ভাগের ২ ভাগ লইলে উহা লাঠির ৩ ভাগের ১ ভাগের সমান হইবে। সুতরাং $\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$।

লাঠিটিকে ১২ ভাগ করিলে দেখা যাইবে যে ৪টি ভাগ একত্র ৩ ভাগের ১ ভাগের সমান।



সুতরাং $\frac{1}{3}=\frac{4}{12}$ অতএব $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}=\frac{4}{12}$

এখন $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{4}{8}$, আবার $\frac{4}{8}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}=\frac{2}{6}=\frac{4}{12}$, আবার $\frac{4}{12}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভগ্নাংশের লব ও হরকে একই সংখ্যা দিয়া গুণ বা ভাগ করিলে ভগ্নাংশের মানের কোন পরিবর্তন হয় না, একই প্রকার থাকে।

উপরে চৌকা বা লাঠিকে সমান সমান ভাগ করিয়া আমরা ঐ চৌকা বা লাঠির কতকগুলি অংশ পাই। সমান ২ ভাগে ভাগ করিয়া আমরা আধা পাই বা $\frac{1}{2}$ পাই। ইহার লবের ১ সংখ্যাটি সমগ্র জিনিসটির কত ভাগ লওয়া হইল তাহাই বুঝায় এবং নীচের ২ সংখ্যাটি সমগ্র জিনিসটিকে কয়ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, তাহা বুঝায়।

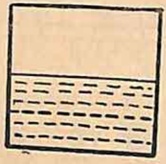
আমরা চিত্র হইতে দেখিতেছি, $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{4}{8}$

এখানে ১ম ভগ্নাংশটির অর্থ সমগ্র জিনিসটির ২ ভাগের ১ ভাগ
২য় ভগ্নাংশটির অর্থ সমগ্র জিনিসটির ৪ ভাগের ২ ভাগ
৩য় ভগ্নাংশটির অর্থ সমগ্র জিনিসটির ৮ ভাগের ৪ ভাগ

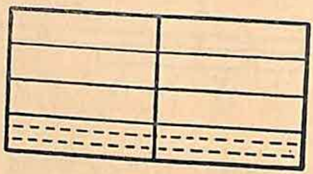
এখন পরপৃষ্ঠার চিত্রগুলি দেখ—১নং চৌকাকে ২ ভাগ করিয়া ১ ভাগ লইলে যতখানি হয়, ২নং চিত্রের ২টি চৌকার ৪ ভাগের ১ ভাগ

করিয়া লইলেও ততখানিই হয়। আবার ৩নং চিত্রের ৪টি চৌকার ৮ ভাগের ১ ভাগ করিয়া লইলেও ঠিক ততখানিই হয়।

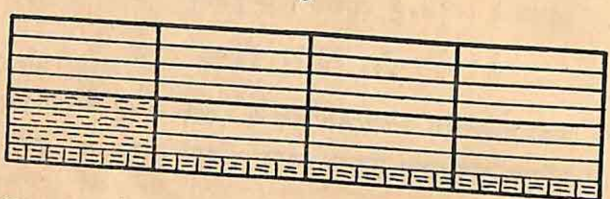
১



২



৩



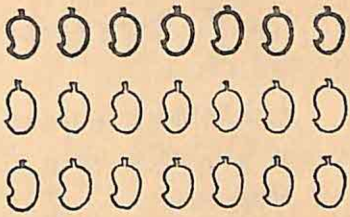
এখন তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যে সব ভগ্নাংশের উপরে ১ ভিন্ন অন্য কোন সংখ্যা থাকে, তাহাদের দুই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। $\frac{২}{৪}$ দ্বারা সমগ্র জিনিসের ৪ ভাগের ২ ভাগও বুঝায়, আবার ২টি জিনিসের ৪ ভাগের ১ ভাগও বুঝায়। $\frac{৪}{৮}$ বলিতে সমগ্র জিনিসের যেমন ৮ ভাগের ৪ ভাগ বুঝায়, তেমনি আবার সমগ্র ৪টি জিনিসের ৮ ভাগের ১ ভাগও বুঝায়।

এখন কিরূপে ভগ্নাংশ পড়িতে ও সেই সঙ্গে লিখিতে হয়, জানা উচিত। আমরা বাম হইতে ডান দিকে ও উপর হইতে নীচের দিকে লিখি ও পড়ি। সেই সাধারণ নিয়ম অনুসারেই ভগ্নাংশও পড়া ও লেখা হয়। $\frac{৩}{৪}$ লিখিতে আমরা আগে ৩ লিখি, পরে ৩ এর নীচে ৪ লিখি; পড়িবার সময়ও আগে ৩ বলিয়া পরে ৪ বলি। সেইজন্য $\frac{৩}{৪}$ ভগ্নাংশকে "৩ এর ৪" বলিয়া পড়িয়া থাকি। আমাদের সাধুভাষায় (বা ইংরাজীতেও) ভগ্নাংশ পড়িতে আগে লবের ও পরে হরের উল্লেখ করা হয়; যথা—$\frac{১}{৩}$ এক-তৃতীয়াংশ; $\frac{৩}{৪}$ তিন-চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

ভগ্নাংশের উদাহরণ—

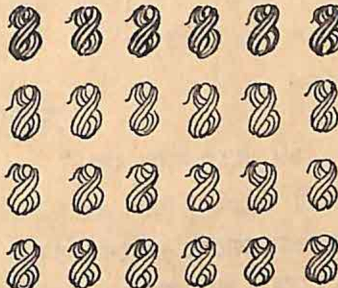
(১) ২১টি আমের $\frac{১}{৩}$ অংশ কত?

২১÷৩=৭টি আম।



(২) ২৪টি সূতার পাটির $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?

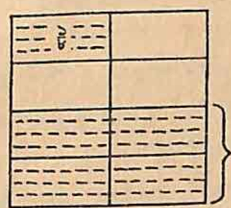
২৪÷৪=৬টি পাটি।



(৩) $\frac{১}{২}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৮}$ কত বার আছে?

$\frac{১}{২}=\frac{৪}{৮}$ ।

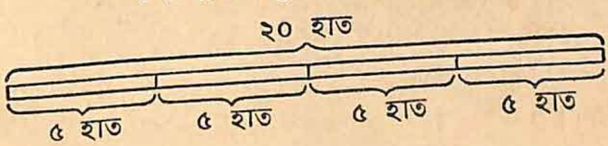
∴ $\frac{১}{২}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৮}$ আছে ৪ বার।



(৪) একটি বাঁশ ২০ হাত লম্বা। ইহার $\frac{১}{৪}$ অংশ কত হাত?

২০÷৪=৫

∴ বাঁশটির $\frac{১}{৪}$ অংশ=৫ হাত।

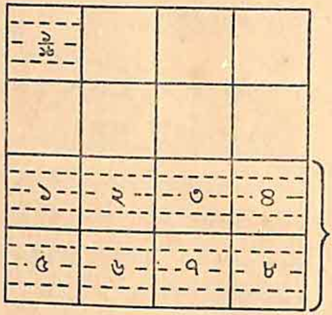


(৫) $\frac{১}{২} = \frac{*}{১৬}$; ইহাতে * স্থানে কত হইবে?

কোন জিনিসের ১৬ ভাগের ৮ ভাগ লইলে তাহার $\frac{১}{২}$ লওয়া হয়।

সুতরাং $\frac{১}{২} = \frac{৮}{১৬}$

∴ * স্থলে ৮ হইবে।



প্রশ্নমালা ১২

১। মুখে মুখে বল—

১০টি আমের $\frac{১}{২}$ অংশ কত?
৪০ জন লোকের $\frac{১}{৮}$ অংশ কত?
১ মণের $\frac{১}{২}$ অংশ কত?
১ মণের $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?
১ মণের $\frac{১}{৮}$ অংশ কত?
১ পাটি সুতার $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?
১ গুণ্ডি সুতার $\frac{১}{১৬}$ অংশ কত?
২ পাটি সুতার $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?
১ লাটি সুতার $\frac{১}{১৬}$ অংশ কত?

২০টি পেয়ারার $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?
১৲ টাকার $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?
২৲ টাকার $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?
৪৲ টাকার $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?
৮৲ টাকার $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?
১৬৲ টাকার $\frac{১}{৪}$ অংশ কত?
২৲ টাকার $\frac{১}{৮}$ অংশ কত?
৪৲ টাকার $\frac{১}{১৬}$ অংশ কত?
৮৲ টাকার $\frac{১}{৩২}$ অংশ কত?

২। নিম্নের শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ কর:—

$$\frac{১}{২}=\frac{}{৪}=\frac{}{৬}=\frac{}{১৪}=\frac{}{১৬}=\frac{}{২২}=\frac{}{৩০}=\frac{}{৩২}=\frac{৫}{}$$

$$\frac{১}{৪}=\frac{}{৮}=\frac{}{১২}=\frac{}{১৬}=\frac{}{২০}=\frac{}{২৪}=\frac{}{৩২}=\frac{৭}{}=\frac{৯}{}$$

$$\frac{৩}{৪}=\frac{}{৮}=\frac{}{১২}=\frac{}{১৬}=\frac{}{২০}=\frac{}{২৪}=\frac{}{৩২}=\frac{২৭}{}=\frac{৩০}{}$$

$$\frac{১}{৩}=\frac{\quad}{৬}=\frac{\quad}{৯}=\frac{\quad}{১৫}=\frac{\quad}{১৮}=\frac{\quad}{২১}=\frac{\quad}{৩০}=\frac{৪}{\quad}=\frac{৮}{\quad}$$

$$\frac{২}{৩}=\frac{\quad}{৬}=\frac{\quad}{৯}=\frac{\quad}{১৫}=\frac{\quad}{১৮}=\frac{\quad}{২১}=\frac{\quad}{৩০}=\frac{৮}{\quad}$$

৩। ১ এর মধ্যে $\frac{১}{১৬}$ কত বার আছে?

৪। $\frac{১}{২}$ এর মধ্যে $\frac{১}{১৬}$ কতবার আছে?

৫। $\frac{১}{৪}$ এর মধ্যে $\frac{১}{১৬}$ কতবার আছে?

৬। $\frac{১}{৮}$ এর মধ্যে $\frac{১}{১৬}$ কতবার আছে?

৭। $\frac{১}{৩}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৯}$ কতবার আছে?

৮। $\frac{১}{৩}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৬}$ কতবার আছে?

৯। $\frac{২}{৩}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৩}$ কতবার আছে?

১০। $\frac{২}{৩}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৬}$ কতবার আছে?

১১। $\frac{৩}{৪}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৪}$ কতবার আছে?

১২। $\frac{৩}{৪}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৮}$ কতবার আছে?

১৩। $\frac{১}{২}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৬}$ কতবার আছে?

১৪। $\frac{২}{৩}$ এর মধ্যে $\frac{১}{১২}$ কতবার আছে?

১৫। ২ এর মধ্যে $\frac{১}{৩}$ কতবার আছে?

১৬। বাবার বয়স ৪০ বৎসর। ছেলের বয়স বাবার বয়সের $\frac{১}{৪}$। ছেলের বয়স কত?

১৭। রহিমের নিকট ১৫টি পেয়ারা আছে। $\frac{১}{৩}$ অংশ তাহার ভাইকে দিল। তাহার ভাই কয়টি পেয়ারা পাইল?

১৮। এক বৃদ্ধা ২৪ লাটি সূতা কাটা হইলে $\frac{১}{৬}$ অংশ বেচিয়া দিল। সে কত লাটি বেচিল?

১৯। এক তাঁতী ৪০ গজ থান কাপড় বুনিয়া $\frac{১}{৫}$ বেচিয়া ফেলিল। সে কত গজ বেচিল?

২০। একটি প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৬০ জন ছাত্র আছে। তাহার $\frac{১}{১০}$ অংশ মুসলমান। বিদ্যালয়ে কত ছাত্র মুসলমান?

২১। একটি গ্রামে ২০০ ঘর গৃহস্থ আছে। তাহার $\frac{১}{৫}$ অংশ চাষী। সেই গ্রামে কত ঘর চাষী আছে?

২২। এক কৃষকের ৩০/° মণ আলু ছিল। সে $\frac{১}{৩}$ অংশ বেচিয়া দিল। সে কত মণ আলু বেচিল?

২৩। একগাছা দড়ি ১০০ হাত লম্বা ছিল। তাহার $\frac{৩}{৪}$ অংশ নষ্ট হইয়া গেল। কত হাত দড়ি নষ্ট হইল?

২৪। একজন কামার ৮০খানা কাস্তে লইয়া গিয়া হাটে তাহার $\frac{৪}{৫}$ অংশ বিক্রয় করিল। সে কতগুলি কাস্তে বেচিল?

২৫। এক জেলে ২৪টি মাছ ধরিয়া $\frac{১}{৩}$ অংশ বেচিয়া ফেলিল। তাহার নিকট কতগুলি মাছ রহিল?

২৬। মুদীর দোকানে ২০/° মণ গুড় ছিল। তাহার $\frac{২}{৫}$ অংশ গরমে নষ্ট হইয়া গেল। এখন তাহার কত মণ গুড় রহিল?

২৭। একজন কৃষক জমিতে ৪৮/° মণ আলু পাইয়াছিল। সে তাহার $\frac{১}{১২}$ অংশ বীজের জন্য রাখিয়া বাকী নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিল। সে কত মণ নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিল?

২৮। একজন ছুতার মিস্ত্রী সপ্তাহে ১২৲ টাকা রোজগার করে। সে তাহার $\frac{১}{৬}$ অংশ সঞ্চয় করে। সপ্তাহে সে কয় টাকা খরচ করে?

২৯। একজন কৃষকের ৩৬ বিঘা আবাদী জমি ছিল। সে তাহার $\frac{৩}{৪}$ অংশে ধান বুনিয়া বাকী জমিতে পাট আবাদ করিল। সে কত বিঘায় পাট আবাদ করিল?

৩০। তোমাদের শ্রেণীতে ৪০ গুণ্ডি সুতা কাটা হইলে পর তাহার $\frac{৫}{৮}$ অংশ কাপড় বুনিবার জন্য দেওয়া হইল। কত পাটি সুতা বাকী রহিল নির্ণয় কর।

৩১। তোমাদের গ্রাম হইতে তোমাদের জেলা-শহর ৩০ মাইল পথ। তুমি মোটর বাসে রওনা হইলে। পথের $\frac{৫}{৬}$ অংশ চলিবার পর মোটর বাস বিকল হইল। বাকী পথ তুমি হাঁটিয়া গেলে। তোমাকে কত মাইল হাঁটিতে হইল?